প্রথম প্রকাশ
২৫ বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
দিলীপ দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

সূচিপত্র

ভূমিকা

একটি লেখা কেন কবিতা হয়ে ওঠে, আরেকটি কেন হয় না, এই প্রশ্নের উত্তর বলা সহজ নয়। এইটুকু শুধু বলা যায় যে বাণীর মহিমাই কবিতার মহিমা নয়। তা যদি হতো তাহলে মানবপ্রেমিক উচ্চারণ মাত্রকেই বলতে পারতুম কবিতা, দেশকালব্যাপী বিস্তারিত উচ্চাশাকেই বলতে পারতুম কবিতা। এ-সব উচ্চারণ বা ভাবনা যে আমাদের সমূহ শ্রদ্ধাই পায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিতা হিসেবে আস্বাদনের জন্যে আমরা অপেক্ষা করি তার রূপের, তার প্রকাশের। আমরা ভুলতে পারি না যে কবিতা শেষ অবধি একটা সৃষ্টিকাজ। তাই, যখনই দেখতে পাই যে এই একটি লেখা হয়ে উঠছে একেবারে নূতন সৃষ্টি, এই একটি অভিজ্ঞতা যা এই প্রথম যেন জেগে উঠল কবির মনে—তখনই তাকে বলতে চাই কবিতা।

আর সেইজন্যেই কবিতা পড়বার সময়ে আমরা লক্ষ করতে চাই তার রূপটুকু, সেই রূপের মধ্যে জেগে-ওঠা কবির ব্যক্তিত্বটুকু। এ-কথার মানে নয় সে-কবিতার বাণীকে একেবারে অস্বীকার করা। এ-কথার মানে শুধু এই যে, সত্য দেখার গুণে এবং তার অনিবার্য প্রকাশের গুণে সহজ কথাও হয়ে ওঠে বাণীর মতো, তুচ্ছকেও যেন শোনায় ধ্যানের মতো। হয়তো এ-কথাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে, সত্তর বছর বয়সে যখন হেমন্তবালা দেবীকে লিখছিলেন তিনি, 'কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখানে আমি মত বিচার করি নে—সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভোগ করতে জানি' অথবা 'কাব্যের যারা যথার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে খোঁজে না, তারা যে-কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেছে তাতেই আনন্দ পায়'।

নতুন দিনের বাঙলা কবিতায় এই রূপ বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা কীভাবে আসে, কখনো কখনো তা ভাবতে হয়েছে আমাদের। সেই সব ছোটো ছোটো বিক্ষিপ্ত সাময়িক ভাবনা এখানে-ওখানে ছাপা হয়েছিল এই দশ বছর জুড়ে, তার থেকে কয়েকটি লেখা সংকলিত ক'রে তৈরি হলো এই বই। এ-যে ধারাবাহিক কোনো সমালোচনা নয়, অনেক পাঠকের পক্ষে সেটা হয়তো অতৃপ্তিরই কারণ হবে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় আমার রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক দুটি লেখা প'ড়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। ওই লেখাকে যে তিনি প্রতিবাদেরও যোগ্য ভেবেছিলেন, সে ছিল আমার পক্ষে মস্ত সম্মানের। তার উত্তর-প্রত্যুত্তরে আমার দিক থেকে হয়তো ঈষৎ চাপল্যই প্রকাশ পেয়েছিল। তবু, আজ প্রায় পাঁচ বছর পরে, যখন দেখছি যে আমার মূল ভাবনার ধরন বড়ো-একটা পালটায় নি এখনো, তখন আইয়ুবের লেখা-সুদ্ধ পুরো সেই বিতর্কটিকে এ-বইয়ের অন্তর্গত করাই সংগত মনে হলো। আইয়ুব তাঁর স্নেহময় সৌজন্যে সে-লেখা এখানে ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন, এ আমার ভাগ্য।

আর, অসীম বন্ধুবৎসল এই 'অরুণা প্রকাশনী'। এ-রকম একটি বইও তাই এত সহজে ছাপা হতে পারল।

শঙ্খ ঘোষ

অলোকরঞ্জনকে

নিঃশব্দের তর্জনী

বড়ো শক্ত ধাঁধা জানে ছোটো একটি মেয়ে। কথা বললেই কোন্ জিনিস ভেঙে যায়?

আরো শক্ত জানতেন অবশ্য দার্শনিক কীয়ের্কেগার্ড, তাঁর ডায়ারিতে যখন তিনি প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের কি কিছু বলার অধিকার আছে আরেক মানুষকে? কেননা তখন তো, তাঁর মনে হয়, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পরমের সঙ্গে সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কেরই তো অন্য নাম নীরবতা।

কিন্তু এমনও কথা কি নেই যাতে নীরবও গ'ড়ে ওঠে?

এখন ইচ্ছে করে যেমন-তেমন বলতে, খুব আপনভাবে, কাঁচা রকমে। খুব ছোটো আর খুব সহজ! এমন, যে প'ড়ে মনে হবে কিছুই নেই-বা এর মধ্যে, মনে হবে যে আধুনিকতার নাম শোনা হয় নি যেন-বা, পড়া হয় নি কোনো সাম্প্রতিক। মনে হবে তাহলে আর লেখা কেন এ কবিতা? বড়ো বেশি বেড়ালের চোখে ভ'রে গেল সমাজ, চাতুর্য বড়ো অনায়াস, সুলভ, সর্বসাধ্য—খোলা ক'রে একজন আরেকজনের চোখে তাকাবে এইটেই হয়ে উঠল শক্ত। তাই এখন অপ্রতিভ মুখ নিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয় সবার সামনে, অপরিচিতদের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ার মতো।

মনে হয় যেন খুব বেশি বলা হয়ে গেল এই কতদিনে। সমস্ত দিনের পর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে গ্লানির মতো লাগে। কথা, কথা। যেন একটু চুপ ছিল না কোথাও, থাকতে নেই, হাতে হাত রাখতে নেই। যে-নীরবকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে সবাই মিলে, কোথায় সে-সব মিলিয়ে গেল বাতাসে, যেন সে-সব জানতে নেই কখনো।

কেউ কারো চোখে তাকাই না কিন্তু সবাই সবার মুখ দেখি। আর সেটা খুব জানা হয়ে গেছে ব'লে, যেমন ক'রে বিকেলের সাজ সাজে মেয়েরা, আমরা সব লোকপুরাণের গুঁড়ো মেখে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসছি। হতে চাচ্ছি স্বয়ংপুরাণ। কিন্তু চৈত্রের হাওয়ার টানে মায়াবী পুরাণ যদি খ'সে যায়! একটি বরং মুখোশ ভালো, মনে হয়। কবি সবারই মধ্যে লুকিয়ে থাকবে ভিড়ে 'সকল'-সাজের মুখোশ নিয়ে—এখন আর এর চেয়ে কী হতে পারে ভালো শরণ? এখন ইচ্ছে হয় তার মধ্যে খুব আড়াল থাকতে, কাঁচা জীবন, সবুজ কথার ছায়ায়।

তাই মনে হয় লিখতে হবে নিঃশব্দে কবিতা, এবং নিঃশব্দ কবিতা। শব্দই জানে কেমন ক'রে সে নিঃশব্দ পায়, ঐশ সূত্র না ছিঁড়েও। তার জন্য বিষম ঝাঁপ দেবার দরকার আছে দুঃসহ আড়ালে থেকে। দুঃসহ, কেননা অন্তরাল সহ্য করাই মানুষের পক্ষে সবার চেয়ে কঠিন। কবিকে তো আজ সবটাই খেয়ে ফেলেছে মানুষ, তাই মানুষের এই শেষ দায়টা মেনে নিয়েও ঘুরছে সে, অন্তরাল ভেঙে দিয়ে এক শরীর দাঁড়াতে চাইছে অন্য শরীরের সামীপ্যে। তা যদি না হয় তাহলেই সহ্য যায় পেরিয়ে,—কিন্তু তবু সেই দুঃসহ আড়ালে ব'সে সে তৈরি রাখবে একটা দৈনন্দিনের মুখোশ; তাকে কেউ চিনবে না, আঙুল তুলে বলবে না 'এ লোকটা কবি', আর তার ভিতর থেকে গোপনে জন্ম নেবে নিঃশব্দ কবিতা।

মনে কি হয় না জীবনানন্দ আমাদের শেখান নি সত্যিকারের

কিছু? যা ছিল তাঁর পরিধান, সে-সমস্তই আসবাবের মতো সাজানো হলো কবিতার ঘরে ঘরে; যা-কিছু কেবল ব্যক্তিগত ব'লেই শ্রদ্ধেয় এবং ত্যাজ্য, কেবল তারই ওপর হামলা হলো জাদুঘরে মৃত শরীর টেনে আনার মতো। কিন্তু কোথায় গেল তাঁর স্বচ্ছ নীরবতার পর্দাখানা? কেবল তারই কাছে তো হওয়া যেত নতজানু!

সুলভ, সুলভ, এত সুলভ বড়োবাজার! দিকদিগন্তে স্ফুলিঙ্গের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া আজ এমন অকাতর ব'লেই আমরা ভেঙে পড়ছি বড়ো রাস্তার মাঝখানে। মজ্জার ভিতরে গর্ব কই, উপেক্ষা কই? মুখ ঘুরিয়ে উদাসীন স'রে-দাঁড়ানো কই? এখন আমরা দাম্ভিক কিন্তু গর্বিত নই, নির্জীব কিন্তু উদাসীন নই, লুব্ধ কিন্তু লিপ্ত নই। পাঁচ মাথার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে স্রোত, কেবল এই ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কাগজের ফুলের মতো খসখসে ব্যালকনিতে। কিন্তু ঐ রঙ্গিণী কাকলির মধ্যে তো থেকে যেতে হবে, তারই সংঘর্ষের ভিতর থেকে বাড়িয়ে দিতে হবে নিঃশব্দের তর্জনী। কবিতা এখন সেই তর্জনী খুঁজে বেড়ায়।

তবে কি ফিরে যাওয়া প্রকৃতিতে? প্রকৃতি, সে তো ছাড়ে না কখনো, তার সঙ্গে রয়ে গেছে দিনরাতের লড়াই; কিন্তু ফিরে যাওয়া নয়। কেননা প্রকৃতিও বিষম বাচাল। মৌন জানে শুধু মানুষেরই বুক, দুয়ের মধ্যে সম্পর্কেই আছে মৌনের বীজ, যেমন জানতেন কীয়ের্কেগার্ড। সেই বীজ ফিরে পেতে চায় শুধু যাপনের নির্যাস। যাপন, যাপন। আছি, আমি আছি—এই ধ্বনি যখন শোনা যায় প্রশ্বাসের আবর্তে, কেবল তখনই দলবাঁধা সব শব্দ ধাবিত হয়ে চ'লে যেতে চায় শেষহীন নীরবের দিকে। হয়তো এখন সেই কবিতার খোঁজ দেবে কেউ। নিঃশব্দ অনায়াস নিবিড় আয়তনের কবিতা, মৃত্যুর পাশাপাশি। যে ফুল তুলে আনি আর হাতে পাই যে ফুল, এ-দুয়ের মাঝখানে এক অবাচ্য নিঃসত্ত্বকে দেখতে চেয়েছিলেন কবি উন্‌গারেত্তি। সেই ফুল, যা শব্দেরই অন্য এক নাম, ছিন্ন ক'রে

এনেছিলেন তিনি নীরবতা থেকে কেবল নীরবতারই মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য,--যেখানে কণ্ঠ ফিরে পায় তার সুঠাম স্বর, গতি ভিতরে ভিতরে জায়গা রেখে দেয় যতির জন্য। আমাদের জন্য কে এনে দেবে শব্দমধ্যগত সেই অবাচ্যতা ?

শব্দ থেকে পালানো

ক্ষুধার্ত একটি পত্রিকায় সেদিন চোখে পড়ল এক-পৃষ্ঠার কবিতা, যেখানে একটিমাত্র শব্দকে জপমালার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি হয়েছে এক নকশা। আবার যাঁরা ক্ষুধার্তের একেবারে উলটো, কবিতাকে যাঁরা করতে চান সীমাহীনরূপে স্পর্শাতীত, তাঁদেরও রচনায় মিলবে ওই একই খেলা। একটি-ছুটি শব্দে, এমন-কী বর্ণে, বর্ণের নানারকম নকশায় কাগজ ভরছেন তাঁরাও। হালফ্যাশানের এক মার্কিন যুবা অনেক বিবেচনার পর তিনটি শব্দকে ভেঙে সাজালেন ছু-লাইনে, হয়ে উঠল আধুনিকতম কবিতার উত্তেজনা। এতটাই তিনি জানাতে পারেন যে টাইপ-রাইটারের রিবনে যদি আবছা হয়ে আসে কালি তাহলে আরেকটা স্বতন্ত্র জন্ম হবে রচনার, কবিতার স্বরূপই যাবে পালটে। খুব নতুন নয় হয়তো, দাদাবাদের সময় থেকেই চলছে ঈষত্তুষ্ণ এই সব মজা-পাওয়া, আরাগঁও আমাদের A থেকে Z পর্যন্ত গোটা বর্ণমালা সাজিয়েই কবিতা নামে উপহার দিয়েছিলেন একদিন। তবে কিনা সম্প্রতি ঝোঁকটা দেখা দিল এদেশেও। বাঙলায় শুদ্ধ কবিতার সন্ধান অথবা মহারাষ্ট্রে 'concrete poetry'র বিশ্বাস কবিদের উশকে দিচ্ছে এই ধরনের অ্যাবস্ট্রাকশনের খেলায়।

কেবল যে কৌতুকভরেই এটা ঘটছে তা ভাবলে অবশ্য অন্যায় হবে। কৌতুক অবহেলা বা নৈরাশ্য কখনোই এর রচনামূলে নেই তা নয়, কিন্তু অনেক সময়েই এর ভিতরে কাজ করে একটা ভ্রান্ত

দার্শনিকতা, গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় শব্দবিলাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। নির্মনা নিরনুভব শব্দপ্রয়োগের বহুলতায় চারিদিকে সবই যখন অস্পষ্ট বোধ হয়, তখন এমন এক অন্ধ প্রতিক্রিয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়তো নয়। আমাদের জীবনযাপনকে ঘিরে ধরেছে পঙ্গপালের মতো শব্দাবলি, কিন্তু ক্রমে টের পাই যে অল্পে অল্পে তার পরিবহণ গেছে নষ্ট হয়ে। নিষ্ফলা কথায় দিন কাটে দ্রুত, রাত্রে ঘরে ফিরে দেখি হাতে সঞ্চয় ঘটে নি কিছু। অভ্যাসবশে কথা বলা আর মিথ্যে বলার এই সমূহ সর্বনাশ শিল্পেও তার চিহ্ন রেখে যায়, কবিতারও অবয়ব হয়ে ওঠে কলরোলময়, বার্তাবিহীন,অভ্যাসতাড়িত। যেমন দেখা হলেই 'ভালো তো' ব'লে পরস্পরের আলংকারিক মাথা-নাড়া আপনিই এসে যায়, বাঙলা কবিতায় আজ পয়ারপঙ্‌ক্তি প্রায় ততটাই অনিবার্য মিথ্যে নিয়ে জুটে যায় কলমের মুখে, বেঁচে থাকার সঙ্গে রচনার সামঞ্জস্যের কোনো প্রয়োজন ঘটে না আর।

হতে পারে যে অপঘাতী এই মিথ্যা বাণিজ্যের ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রথম আবেগে শব্দেরই ওপর একটা ভুল অভিমান তৈরি হয়। মনে হয়, যার পরিবহণ নেই তাকে আমার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু, শব্দজাত মিথ্যেকে উপেক্ষা করার চেষ্টায় এ হলো শব্দকেই উপেক্ষা করা। এই উপেক্ষায় যে-কবি ফিরে যান একটি-দুটি শব্দে, এমন-কী বর্ণে, বর্ণেরই নানারকম নকশায়—নিজের অগোচরে তিনি কবিতাজগৎ থেকেই নিষ্ক্রমণের পথে এসে দাঁড়ান। এখনো তিনি হয়তো তাঁর খেলাকে মহিমান্বিত ক'রে নিয়ে ভাবছেন, কবিতা আজ একটা অডিও-ভিশুয়াল ব্যাপার, কেবল শ্রুতিগম্যই নয়; হয়তো মনে মনে এইরকম একটা ন্যায় তৈরি করেছেন তিনি যে শব্দের একক ক্ষমতা আজ লোপ পাবার পথে। কিন্তু এই ভাবনাই কবিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার ক'রে নেবার গলিপথ। এই অবিশ্বাস বড়ো হয়ে উঠলে বিদেশী এক লেখকদলের মতো আমাদেরও শেষে ঘোষণা করতে হবে: কবিতা আর নয়!

মার্টিন হ্বালসের, পিটার হাম এবং এই ধরনের আরো দু-চারজন জার্মান লেখক নাকি অল্পদিন আগে জানিয়ে দিয়েছেন, নাটক-কবিতা-গল্পের মধ্যে আর তাঁরা নেই।[১] শব্দনকশা-প্রবণ লঘু লেখকদের কথা নয়, আমাদেরও প্রধান কবিদের মধ্যে কি কখনো দেখা দিচ্ছে না তুল্য সংশয়? সমর সেন যে কবিতা ছেড়ে যান তার কারণ নিশ্চয় ভিন্ন, কিন্তু সন্দীপনের রচনাকার্পণ্য অথবা উৎপলের সাম্প্রতিক নীরবতা এই সূত্রে ভেবে দেখবার যোগ্য। কেন উৎপলকে ভাবতে হলো আজ যে মিক্স্‌ড্‌ মিডিয়া বা মিশ্রপন্থা ছাড়া শিল্পে মুক্তি নেই আর?

এটা ঠিক যে এঁরা যা ধরতে চেয়েছিলেন সে হলো অনতিব্যক্ত এক সাংগীতিক প্রতিমা। কবিতা নিজেই নিজের সম্পূর্ণ সত্তা, সে কেবল স্পর্শ ক'রে থাকে সেই প্রতিমা। তাই তার আর কোনো দ্বিতীয় মানে নেই, কোনো প্রতিশব্দ হতে পারে না তার; 'দ্বিবিধ অর্থময় রায়গুণাকর ছিল অনেক বাচাল' (উৎপলকুমার বসু)। তাই হয়তো কবিসভায় কবিতার তাৎপর্য বুঝতে চাইলে গিন্‌স্‌বার্গকে নির্বসন হবার উপক্রম করতে হয়। এবং হয়তো সেই কারণেই, ঈষৎ খেলাচ্ছলে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিচার করেন সন্দীপন কেবল গদ্য-অন্বয় ক'রে, কখনো-কখনো পরিহাস্যতার ঝুঁকি নিয়ে শব্দের মানে ব'লে দিয়ে, কেননা স্বতন্ত্র শব্দের অনেক অভিধা-অর্থ আছে, কিন্তু পুরো কবিতার নেই কোনো যোগ্য প্রতিশব্দ। অর্থ-তাৎপর্য খুঁড়ে আনবার চল্‌তি সমালোচনার বিরুদ্ধ অভিমান ব'লে মুহূর্তে একে চিনতে পারা যায়, এর মধ্যে প্রায় এতটাই বলবার ইচ্ছে যেন প্রচ্ছন্ন যে কবিতাও শুদ্ধ সংগীতের মতো বিষয় আর বিন্যাসে একাকার লীন, পৃথক ক'রে তাকে ভেঙে দেখাবার কোনো মানে নেই।

১ প্রবন্ধটি রচিত হবার পর জানা গেল, এঁদের মধ্যে অন্তত হ্বালসের তাঁর সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করেছেন। সম্প্রতি একটি ইণ্টারভিউতে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর ভবিষ্যতের লেখা হবে আরো জটিল, আরো উচ্চাশাময়।

কিন্তু সংগীতকে যদি ভাবা যায় শুদ্ধতম শিল্প, যেমন ভেবেছিলেন টমাস মান বা রবীন্দ্রনাথ, তবে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যেই কি ছবি অথবা কবিতার মুক্তি? যে-আক্ষেপে ভালেরি লিখেছিলেন জিদকে: 'এক পৃষ্ঠা লেখা কি কখনোই একটুখানি স্বরলিপির মহিমায় পৌঁছতে পারে'—সে-আক্ষেপও তো তাঁর রচনাকে রুদ্ধ করতে পারে না শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এই ভাবনারই উৎস থেকে ছবি বা কবিতা ক্রমে এগিয়ে যায় সাংকেতিক সাংগীতিক বিশ্বে। আর তারও পরে অনেক স্তর পেরিয়ে যখন আজকের দিনের নামহীন ছবি নামহীন কবিতার ধূসর অ্যাবস্ট্রাকশনে পৌঁছই, সেখানে এসে দেখি কেবল কম্যু-নিকেশন নয়, মালার্মে-প্রস্তাবিত ইনিসিয়েশন-সুদ্ধ বন্ধ। তখন? তখন সমকালীন এক বিদেশী ভাবুকের মতো বলতে লোভ হয় যে ভবিষ্যৎ কাল একদিন বিহ্বল ঘৃণা নিয়ে তাকাবে এই পরম ধূসরতার দিকে।

অর্থাৎ সংগীতের মতো হওয়া আর সংগীত হওয়া এক কথা নয়। শব্দ যে তার চারপাশের জড়ত্ব নিয়েই এগোতে চায় সত্যের দিকে, এই তো তার গৌরব। একথা ঠিক যে, 'কবির শব্দ যেখানে থামে, আলোর সেখানে শুরু'। কিন্তু কবির শিল্পই তো এই যে তিনি পারেন শব্দকে সেই আলোর তটভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। শব্দের পারম্পর্য নতুন ক'রে গাঁথা হয়ে যায়, তারই মধ্যে রণিত হয় নিঃশব্দ সংগীত, এবং তখন:

> সবুজ রহস্যময় আত্মা, তুমি বাছা, চাও না কি সশব্দ প্রস্থান তৃণবেহালার মতো—ধুনুরীর তাঁতের ভিতর থেকে তুলোর ভিতরে তুমি চাও না কি চলে যেতে—আমাকে কি ছেড়ে যেতে চাও তুমি, সবুজ রহস্যময় আত্মা, আমি তোমাকেই খুঁজে ফিরি মাঠে—আমি শ্যাওলায় মাখা কূট প্রদীপের বাটিগুলি খুঁজে পাই এখানে সেখানে—আজ সকালেই বৃষ্টি শুরু হলো[২]

—দেখা দিতে থাকে প্রতিশব্দহীন এইসব পরমতা। কেন তাহলে পুরো হার হবে আজ? কেন একদিকে বর্ণমালার নকশা, আর

২ উৎপলকুমার বসু, পুরী সিরিজ, পৃ ৩২

অন্যদিকে একই প্রতিক্রিয়ায় মিশ্রশিল্পের বিকল্প? একটা মস্ত অবজগৎ দেখতে দেখতে জেগে উঠল যেখানে ছবিতে আলোয় সুরে শব্দে মেশামেশি হয়ে শরীরকে সুদ্ধ ক'রে নিয়েছে শিল্পবাহন। শরীর, সে তার সমস্ত আর্তনাদ বাঁকিয়ে ধ'রে তৈরি করছে ছবি নাচ কবিতা। কেবল হিপি-সমাজে নয়, এই একটা নতুন সংস্কৃতিমণ্ডল রচিত হবার উপক্রম আজ সব দেশেই অল্পবিস্তর স্পষ্ট। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে এই নতুন জগৎ কবিতার প্রতিস্পর্ধী নয়, তার সমান্তরাল মাত্র। এই শিল্প যে অভিজ্ঞতা দিতে পারে তার তুল্য অভিজ্ঞতা অর্জন কবিতার পক্ষেও অসম্ভব নয়। কবিতারই সে চেষ্টা, শব্দেরই সে চেষ্টা, শব্দ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়। তাই মিশ্রশিল্পে নয়, সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাকশনের ঝোঁকে নয়, এমন-কী মিনেসোটার কবিদল যে নিঃসঙ্গ প্রাকৃতিক আয়োজনে মগ্ন থাকবার কল্পনা করেন আজ তারও মধ্যে নয়, আরো বাইরে-দূরে ঘুরিয়ে ফেলতে হয় জাল।

কেননা সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করতে চাই দৈনন্দিনের। প্রবল প্রহারের উত্তেজনার মধ্যে আমাদের জীবন। একদিকে হাতে রাখি চাঁদের শিলা, অন্যদিকে বরফজমা শীতের মাঠে প্রতিবাদরত মেয়েদের ওপর মুদ্গর তোলে গণতন্ত্রী পুলিশ, বর্ণের কারণে ধর্মের কারণে এদেশে-ওদেশে জীবন হয় জামিন, ফুটপাথে ফুটপাথে জ্যোতিষীর নিয়তিরেখা রাতারাতি পালটে যায় নিষিদ্ধ ইস্তাহারে, উজ্জ্বল মেধাবী যুবাদের মাথা থেকে কব্জি পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে সামর্থ্যের সংযোগ। বিশাল এই সময়কে তুলে আনবার জন্যই মিশ্রশিল্পের জটিল আয়োজন আজ, কিন্তু নিছক শব্দও কি জানে না তাকে ছুঁতে?

অন্তত তারই চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ধরনে গ'ড়ে উঠছিল ক্রিলি বা গিন্‌স্‌বার্গ, সেলান বা ভজ্‌নেসেন্‌স্কির রচনায়। তাঁদেরও অভিমান শব্দের ফাঁপা সংসারের বিরুদ্ধে, আমাদের সাবেক ভণ্ডতার বিরুদ্ধে, কিন্তু সেই অভিযান তাঁরা নিয়ে যান শব্দেরই মধ্য দিয়ে। চিৎকারের

বিরুদ্ধে চিৎকার? এঁদের কেউ কেউ একটু বেশি চিৎকারশীল? কখনো কখনো হয়তো তাই। কিন্তু গিন্‌স্‌বার্গ-অনুরাগী কবিও জানেন যে এমন-কী এই কবিও—যিনি স্বপ্নের বশে নেশার ভরে কবিতা লেখেন ব'লে শোনা যায়—তাঁকেও গণ্য করতে হয় শব্দের সংযম, তাঁকেও বরণ করতে হয় পাউণ্ডের শিষ্যতা। উইলিয়ম্‌স্‌ যে 'mystical ears' দেখেছিলেন এজরা পাউণ্ডে, গিন্‌স্‌বার্গকে মুগ্ধ করে সেই শ্রুতি, তিনিও শিক্ষা নিতে চান ক্যাণ্টোজের তুলনাহীন শব্দশাসন থেকে। প্রগল্‌ভতার মধ্যে এই শাসন, চিৎকারের মধ্যে এই সংগোপন নীরবতা যে সব সময়ে ধরতে পারেন এই কবি তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু এই বৈপরীত্যের বুনন না থাকলে শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় হতো না তাঁর কবিতা। যে সত্তার সামঞ্জস্য খোঁজেন এই বৌদ্ধ ইহুদী, যে অদ্বয় সংযোগ, তা হয়তো চোখ এড়িয়ে যায় ফ্যাশান-লুব্ধ চটুল পাঠকের। কিন্তু যদি আমরা জানতে চাই তাঁর জেনারেশনের যে শ্রেষ্ঠ মনগুলিকে ধ্বংস হতে দেখেছেন তিনি, কী ছিল তাদের ভিতরকার আর্তনাদ—তবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এক 'yearning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night'। ভিতরদিকের সূর্যমুখী এই চরিত্র হলো চিৎকারেরই আরেক পিঠ: 'we are all beautiful golden flowers inside'!

আসলে, যাকে বাইরে দেখি প্রহার বা ক্রোধ, তারই অন্য পিঠে আছে গহন কান্না। এ ছাড়া কোনো বড়ো শিল্প নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যে কোথায় আছে তার অস্তিত্ব? এই যে পিঁপড়ের মতো ব্যস্ততা চলছে সমস্ত সংসার জুড়ে, নিয়মে হিসেবে বাঁধা, নির্বোধ ব্যক্তিগত উচ্চাশার হানাহানি, মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়িয়ে যদি কেউ সেই অবোধ চলার উলটো দিকে তাকান, তার সঙ্গে তৈরি করেন একটা সম্পর্ক, অমনি দেখা দেয় অন্তরালবর্তী এক রোদসীরেখা, জেগে ওঠে আরেকটা উর্মিময় দেশ। এই দেখাই, চল্‌তি জীবনের আত্মার সঙ্গে

এই গোপন সম্পর্কই কবিতা, এইখানেই ধরা দিতে থাকে ভয়াবহ এক পরিণামহীন মীমাংসাহীন সত্য। আর এই সত্যকেই, এই সম্পর্ককেই আবিষ্কার ক'রে নিতে চায় নীরবতা, শব্দমধ্যবর্তী নিঃশব্দ। তার জন্য গিন্‌স্‌বার্গের ধরনকেও কখনো কখনো মনে হয় অভিজ্ঞতার বাহুল্য বিস্তার, মনে হয় এই একই অভিজ্ঞতা থেকে তুলে আনা যায় একখানা ছাঁচ, একটি রোদন, যার অন্য পিঠে আছে প্রহার বা ক্রোধ। কথা বিরল হয়ে আসতে চায় এ ছাঁচ তুলে নিলে, কিন্তু তবু সে তার প্রতিমূহূর্তের টান ঠিক রাখে অভিজ্ঞতার সংসারে। সে-দিকে যখন যেতে চায় কবিতা, তখন নিঃশব্দ মানে শব্দ থেকে পালানো নয়, শব্দকে ঈথারমণ্ডিত ক'রে তোলা মাত্র, অভ্যস্ত শব্দসম্পর্কের আলস্য ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে সত্যের প্রবাহ নিয়ে আসা। কবিরই সেই কাজ।

শব্দের পবিত্র শিখা

তাঁর প্রিয়ার বর্ণনা হবে কেমন ক'রে? তাই কীটস চেয়েছিলেন উজ্জ্বলের চেয়ে উজ্জ্বলতর এক শব্দ, সুন্দরের চেয়ে সুন্দরতর এক শব্দ। শুদ্ধ আবেগ সত্য আবেগকে প্রকাশ করবার মতো শুদ্ধ সত্য শব্দ কোথায় এত মিলবে? যে-শব্দ সকলেরই, প্রত্যেকের প্রত্যহের দ্বারা যে-শব্দ 'ব্যবহৃত, ব্যবহৃত,...'—কিন্তু না, জীবনানন্দের এই বাক্যখণ্ডও এখন অতি-উল্লেখে গলিত হয়ে গেছে—কোন্ কাজে তা লাগবে কবির? কবিও তো চান প্রেমিকের মতোই তিনটিমাত্র প্রজাপতির দিন, মানবজীবনের পঞ্চাশ বছরের চেয়ে তীব্র তিন দিন, যার মধ্যে তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে ভ'রে দেওয়া যায়। কিন্তু ভরণের যোগ্য শব্দ কোথায়, শব্দ কি মেলে? তাই শব্দের সঙ্গে কীটসের ওই সংগ্রাম আসলে কবিমাত্রেরই সংগ্রাম, গোপন কিংবা প্রকাশ্য এই সংগ্রামেই একজন কবির জীবনেতিহাস।

কিন্তু উজ্জ্বলের চেয়ে উজ্জ্বল শব্দ কেমন ক'রে লেখা হবে? কিংবা, কথাটা হয়তো এই যে 'উজ্জ্বল' ঠিক কেমন ক'রে উজ্জ্বলতার আঘাত দিতে পারে বুকের মধ্যে? ওটা যে মিথ্যে নয়, ও যে একটা মুখস্থ শব্দমাত্র নয়, হৃদয়স্থ অভিমান, একজন কীটস কেমন ক'রে তা বোঝাতে পারেন তাঁর প্রিয়াকে অথবা পাঠককে? তখনই শুরু হয়ে যায় ওই ইতিহাস, কবিতার কারুঘরে আসেন কারিগরেরা, সাজাইবাছাই করেন শব্দ, আর অভিপ্রেত মর্মভেদী অব্যর্থ শব্দগুলিকে একে একে খুঁজে নিতে থাকেন স্তূপাকার সেই বিষণ্ণ ভাণ্ডার থেকে।

অথচ এ কথাটারও কোনো মানে নেই। শব্দ খুঁজে বার করা যায় কী ভাবে? অথবা 'শব্দ খোঁজা' কথাটার ঠিক তাৎপর্যই বা কী? পুরোনো শব্দগুলিতে শুকনো ছেঁড়া কাগজের মতো খসখসে আওয়াজ হয়, প্রকাশহীন নির্জীবতা তার সমস্ত অবয়বে, অতএব তাকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে, এই কি কথা? সন্দেহ নেই যে এক-একটা নব্য আন্দোলনের সূচনায় এ-কথাটাই খুব জোর পায়, ব্যাকরণ হয়তো টের পাবে যে এইসব মুহূর্তেই শব্দভাণ্ডারের প্রসার বেড়ে যায় খানিকটা। কিন্তু নতুন শব্দ ব্যবহার করবার জরুরি প্রেরণা স্বীকার ক'রেও জিজ্ঞাসা করা সংগত যে আক্ষরিক অর্থে নতুন শব্দের সৃষ্টিই কতজন বড়ো কবির সাফল্যের চাবি।

নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়। মধুসূদনের মতো পরিশ্রমী শব্দচয়ন কবিতাকে একটা স্বতন্ত্র চেহারা দেয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তারই মধ্যে লুকোনো থাকে পতনের বীজ। একরকম অভ্যাস তৈরি হতে পারে কবিতায়—ম্যানারিজম—যা হয়তো কবির স্বাতন্ত্র্যকে ঠিক ঠিক ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কবিতার কাজ তো কেবলমাত্র কবির স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেওয়া নয়, প্রতিটি কবিতায় আরো একবার নিজেকে প্রতিফলিত ক'রে তোলাই কবির পক্ষে প্রয়োজন। শব্দরচনার অতিসাধ্য প্রেরণা শেষ পর্যন্ত কবিকে ঐ জড় অভ্যাসের মহাতমসায় ঠেলে নিতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেই যায়।

নতুন শব্দের সৃষ্টি তাহলে শেষ কথা নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই মূল। কিন্তু শব্দের নতুন সৃষ্টি কেমনভাবে সম্ভব? তখন আমাদের মনে পড়ে যে গ্রন্থকীটের ভাষা নয়, লৌকিক ভাষা মৌখিক ভাষাই হলো কবিতার অবলম্বন। কবিতার শব্দ নামে পৃথক কোনো বস্তু নেই, সমস্ত প্রচলিত শব্দই কবিতার শব্দ। কিন্তু এ-কথাও তো আজ কতদিনের পুরোনো! দেড়শো বছর আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন ঐ-রকম, ঐ একই প্রেরণা ছিল হুইটম্যান বা আর্নো হোলৎসের,

তিরিশ বছর আগেও ঐটেই ছিল কবির মূল ঘোষণা, আবার আজও বীট কবিরা বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও-রকম ভাবছেন। তাঁর সম্প্রতন আলোচনায় এলিজাবেথ জেনিংসও জানিয়েছেন যে তাঁর সতীর্থ কবি-বন্ধুরা ভাষাকে এখন দেখেন 'not as a lofty, transcendent medium but as a tangible vehicle worthwhile meaning and honest reflection!' যদিও এসব যুগ আর নামের মধ্যে দূরান্ত ব্যবধান, তবু এই একটা জায়গায় সবাই মিলে যান কেমন ক'রে? ঠিক মিলও কি বলা যায় একে? কেননা মৌখিক ভাষা সম্পর্কে ধারণা আর অভিজ্ঞতা তো সবার একরকম নয়, আবার যুগে যুগে এর একটা স্তরানুক্রমণও ঘটে যায় ধীরে ধীরে। কথাটা এই যে মুখের সচল ভাষা তার পরিবর্তমান উজ্জীবনী প্রাণ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চ'লে যায়, নানা ভূমির নানা জনে সেখান থেকে এক-এক অঞ্জলি জল নিয়ে তাঁদের পাত্র পূর্ণ ক'রে নেন। কিন্তু কোথায় সে জল টলটলে, কোথায়-বা জীর্ণ উদ্ভিদের শবে ভরা, কোথায় ঘুলিয়ে-ওঠা পঙ্কতিলক, তা কি স্থির ব'লে দেওয়া যায়।

বস্তুত, অভিজ্ঞতা ধারণা ও প্রেরণার ভিন্নতা আর পূর্বকথিত ঐ ক্রমিক স্তরাবরোহণের ফলে এক-একটা সময়ে কবিতার জগতে বড়োরকমের কোনো চমকচাঞ্চল্য তৈরি হয়। ছোটো ছোটো সিঁড়ির পর এ যেন এক মস্ত সিঁড়ি, লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসবার ধাক্কাটা বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। বেশ বোঝা যায় যে কবিরা এখানে শব্দের ব্যবহারে দুঃসাহসী হবার ব্রত নিয়েই এলেন, পূর্বতন জড়তাকে মোচন করবার মহত্তম উপায় ব'লে তাঁরা গণ্য করেছেন একে। মনে পড়ে যায় তিরিশ বছর আগে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কবিযশঃপ্রার্থী এক তরুণকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই পদ্ধতির শেষ লক্ষ্যটা কী? আঘাত দেওয়া? রুচিতে আঘাত? সংস্কারে আঘাত? কিন্তু আঘাতটা কি আঘাতেই শেষ অথবা এর পরে কিছু প্রাপ্তি থাকে আমার, কবিতার দিক থেকে প্রাপ্তি? 'Whistling as

he shuts/His door behind him, travelling to work by tube/Or walking to the park *to ease the bowels*'—এই পর্যন্ত লিখে, ঐ ইটালিক্‌সে পৌঁছে, কবির ঈষৎ আত্মতৃপ্তির উদয় হলো ব'লে সন্দেহ হয়, কেননা অনভ্যস্ত পাঠক-মাত্রকেই তিনি একবার ঝকমকিয়ে দিতে পেরেছেন ব'লে ভাবেন। কিন্তু পরিচিত শব্দের এই অস্থানিক ব্যবহারে কবিতার যোগ্যতা কি সত্যই বাড়ল কিছু? অন্যপক্ষে, পাঠকের প্রতি এই আঘাতের শেষ উদ্দেশ্যই বা কী?

এমন নয় যে ঐ শব্দের বিরুদ্ধে আপত্তি কোনো নীতিরুচির দিক থেকে। উদাহরণযোগে প্রমাণ করা সম্ভব যে দেশকালবন্দিত মহাকবিরা শব্দের কোনো জাতিবিচার গণ্য করেন না, নীতির প্রশ্ন ওখানে অবান্তর। রিচার্ডসের সেই পুরোনো কথা হয়তো মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে শব্দের কোনো ভালোমন্দ নেই, না, ভালোমন্দ আছে কেবল ব্যবহারের। অলোকরঞ্জন যদি আক্ষেপ ক'রে ব'লে ওঠেন 'শব্দের পবিত্র শিখা নিয়ে ঐ অপব্যবহার' তাও এক অর্থে সংগত ব'লে ধরা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হয় যে শিখাটাই পবিত্র, কথাটা 'পবিত্র শব্দের শিখা' নয়। শব্দের কি নিজস্ব কোনো পবিত্রতা আছে? জড় স্থাণু একটা শব্দ একক, তার কোনো শক্তি নেই জনন নেই, অপর এক শব্দের সমবায় সংঘর্ষে সে জ্ব'লে ওঠে। যেমন সমস্ত পাপহর অগ্নিদেবতা, কবিতাও তেমন। তার আগুনের মধ্যে সমিধ হয়ে আসতে পারে যা-কিছু, তাই অবশেষে পবিত্রতা অর্জন করে। কিন্তু সেই লেলিহান আগুন কি কবিকে সুদ্ধ গ্রাস ক'রে নেবে?

উল্‌ফ-উল্লিখিত ঐ লাইনটির অপরাধ তার শব্দে নয়, শব্দের ব্যবহারে। মনে হয় যে কবিতার আগুনে শব্দটি সমর্পিত হতে পারে নি, ব্যবহার করতে পারায় কবির খুশি প্রায় ধরা প'ড়ে যায় লাইনটি থেকে, অন্য সমস্তকে ছাপিয়ে ওঠে শব্দটির মাথা। কবির উপাদান কেন কবির চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে? বড়ো কবির রচনায় যেমন

ছন্দকে, তেমনি তার শব্দ বা প্রতিমাকেও মুহূর্তমধ্যেই চোখে পড়তে দেখি না, তা পড়তে পারে কেবল দ্বিতীয় পাঠে। তাঁর এই উপাদান উপকরণগুলিকে কবি এমন একাগ্র সমতায় এবং সমগ্রতায় মিলিয়ে দেন যে পৃথকভাবে তার ধাক্কাটা বড়ো হয়ে উঠতে পায় না, আমরা আস্বাদন করি কেবল সমগ্রের।

আপাতমন্দ শব্দ ব'লে নয়, ওর বিরুদ্ধে আপত্তি ওর স্বয়ম্প্রকট অস্তিত্বের জন্য। এমন-কী সৎশব্দও ঠিক ততটাই আপত্তিযোগ্য হয়ে দেখা দিতে পারে কবিতায়, লোকনীতির দিক থেকে নয়, সাহিত্য-নীতির দিক থেকে। এই সহজ কথাটাও মনে করিয়ে দিতে হলো এই জন্য যে শব্দের কোনো অস্পৃশ্যতা প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রায় নয়, সব শব্দই কবিতার শব্দ হতে পারে ব'লে আমারও বিশ্বাস, কিন্তু শব্দ যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্দেশ্যহীন না হয়, সমগ্রতার সঙ্গে সমবায় যেন সে ছিন্ন না করে এবং 'চমকের আঘাতটাই একমাত্র বরেণ্য' অবশেষে কবিও যেন এই ভুল না ভাবেন।

সত্যি সত্যি, রক্তবীজের মতো নিত্যই নূতন শব্দ বেড়ে যায় না। শব্দের নূতন ব্যবহারের জন্য যা চাই তা হলো এর অনায়াস-পারম্পর্য ভেঙে ফেলা। প্রত্যেক যুগেই কবিতার ভাষায় একটি নির্দিষ্ট গড়ন, স্থির কোনো প্রণালী বাঁধা হয়ে যায়, তার অনুসরণ চলতে থাকে অন্ধ আনুগত্যে। অনুসারী কবিরা হয়তো এই অন্ধ শব্দে আপত্তি করবেন, হয়তো সত্যি যে অনেক সময়ে তাঁদের অনুভব যথার্থ, প্রকাশের বেদনার মধ্যেও কোনো আত্মছলনা নেই। কিন্তু নিজেরও অগোচরে কত সময়ে আমরা দাসত্ব ক'রে যাই! যেমন এলিয়ট বলেছিলেন, খারাপ কবি তিনিই যিনি জানেন না কোথায় সচেতন আর কোথায় অবচেতনের উপর ভর করতে হবে তাঁকে। অন্তত প্রকাশের মুহূর্তে কবিকে জানতে হয় পূর্বসূরী বা সমকালীন সিদ্ধিগুলির কথা, তৎ-সাময়িক প্রচলিত বাঁধিবুলির ধরন বুঝতে হবে তাঁকে, আর সেই বেড়াগুলি ভাঙবার জন্য তৎপর হয়ে উঠতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। একই

শব্দে হয়তো কাজ চ'লে যায় যেমন এক লোহাতেই সমানভাবে তৈরি হতে পারে শিকল আর হাতিয়ার, কিন্তু শিকলের গাঁটগুলিকে আঘাত ক'রে ভেঙে দেবার কথা ভাবতে হয় কবিকে। একটি বাক্য বা বাক্যখণ্ডের মধ্যে শব্দ সাজাবার যে পদ্ধতি, তারই মধ্যে থেকে যায় এই গাঁটগুলি। ঠিক শব্দের উপরেই আঘাত তত জরুরি নয়, যতটা জরুরি মধ্যবর্তী ঐ অংশগুলির উপরে আঘাত, দুই শব্দের সংযোগ-বিন্দুর উপরে।

এই কারণেই কখনো কখনো কবিতার ভাষায় দেখতে পাই অন্বয়গত বিপর্যাস। অবশ্যই স্মরণীয় যে অন্বয় পরিবর্তনের আরো একটি মূল প্রেরণা আছে বক্তব্যগত দার্শনিকতায়, কিন্তু শব্দকে এই নবীনতায় টেনে নেওয়াও যে তার অন্যতম অভিপ্রায় তা স্বীকার করতে হবে। এ একটা উপকারী ফলপ্রদ অভ্যাস, যদিও ঐ অভ্যাস শব্দটিই আবার বিপদের সংকেত দেয়। কবি কি এক দ্বিতীয় ম্যানারিজমের দুয়োরে যাচ্ছেন না? মধ্যবর্তী পর্যায়ের কিছু কবিতায় বিষ্ণু দে-কে যেমন মনে হচ্ছিল নিজেরই অভ্যাস তাঁকে শৃঙ্খলিত ক'রে আনছে, এবং তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় যেমন নিজেরই বন্ধন থেকে পুনর্মুক্তির খোঁজে উৎসুক দেখি তাঁকে—সে-সব ওই পূর্বকথিত ভয়কেই বাড়িয়ে দেয় মাত্র।

কেবলই অন্বয় নয়, একই চেতনা থেকে কখনো-বা চোখের সমস্ত অভ্যাস ভেঙে দিয়ে কবি যেন একটি দৃশ্যগ্রাহ্য গড়ন তৈরি করতে চান, যার মধ্যে শব্দ তার প্রাণ খুঁজে পায়। ডিলান টমাসের বরফি-প্যাটার্ন কবিতার আর কী উদ্দেশ্য ছিল আমি তো অন্তত বুঝি না, সত্যেন্দ্রনাথের বেলা তা হয়তো কেবলই ক্রীড়ারঙ্গ, আর কামিংসের ভাঙা ভাঙা উলটোপালটা শব্দব্যূহ রচনাতেও চোখেরই সঙ্গে যুদ্ধ। সন্দেহ নেই যে আধুনিক কালে কবিতা যখন ছাপার কাগজ থেকে পড়া হয়, ধ্বনিগুণই তার একমাত্র গুণ থাকে না, ভাবতে হয় তার দৃশ্যগুণও। শ্রুতিতে-দৃশ্যে একটা সংযোগ চাই শব্দগুলির মধ্যে, যেন শব্দেরও

বর্ণেরও হাসিমুখ কান্নামুখ আছে, যেন বর্ণও কেউ ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সিটওয়েল দেখেন এক-এক শব্দে এক-একরকম রঙ বা স্পর্শের আভাস, র‍্যাঁবো তাঁর স্বরমালায় লিখে রাখেন 'আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল'। যদি বর্ণেই এত রূপরঙ, তবে শব্দে আর শব্দের পরম্পরায় আরো কিছু আছে নিশ্চয়, দৃশ্যতই কবিতা একটা প্রকৃতিগঠন অর্জন ক'রে নেয়, আর কবি তাই তাকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নূতন গড়ন বানান। কামিংসের স্বেচ্ছাচারের পিছনে বক্তব্য আর আকৃতির সাযুজ্যের দাবি বস্তুতপক্ষে অগ্রাহ্য লাগে, এই পর্যন্ত কেবল মনে হয় যে শব্দগুলি ঐ স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও—অথবা মধ্যেই—নৃত্যপর হয়ে একরকম সজীবতা লাভ করেছে।

এই সজীবতা শব্দটি ঠিক। নিশ্চয় সজীব, কিন্তু কতদিন সজীব, কতক্ষণ? ক্ষণজীবী পতঙ্গও জীবনশীল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিও কি ক্ষণসাময়িকের ভিখারি? চিরন্তনের অভিমান কিছুই কি তার নয়? অর্থাৎ এই ব্যবহারভঙ্গি থেকেও কি আমরা আরেক অচল অভ্যাসে পৌঁছব না? এই হলো কবির তৃতীয় ম্যানারিজমের সূত্রপাত।

বস্তুত, উল্লিখিত এই সব পর্যায়েই আমরা দেখি যে শব্দ বা শব্দ-পরম্পরার প্রতি কবির আক্রমণ নিতান্ত তার বাইরের অবয়বে। কিন্তু অন্তর্গূঢ় আক্রমণ ভিন্ন কি শব্দের নূতন দ্যোতনা সম্ভব? আর, কেমন ক'রে সম্ভব এই ভিতরকার আক্রমণ?

বলেছিলাম, দুই শব্দের সংযোগবিন্দুর উপর আক্রমণটাই সবচেয়ে জরুরি, ঐখানে যে মৃত বাঁধনে জড়িয়ে থাকে তারা, সেই বন্ধন খুলে দেওয়াই কবির কাজ। কিন্তু কোথায় সেই সংযোগবিন্দু? তা কি দেখা যায়? সে তো অদৃশ্য। অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে কেমন ক'রে লড়াই সম্ভব? মেঘের আড়াল থেকে যে যুদ্ধ করে তাকে জিতে নিতে হলে মেঘের আড়ালেই চ'লে যাওয়া চাই, অদৃশ্যের হাতে অদৃশ্যের মার।

প্রথম প্রশ্ন এই যে শব্দকে ধ'রে রাখে কে? কবিতাতেই বলো আর গদ্যেই বলো, শব্দকে ধ'রে রাখে তার ছন্দ বা স্পন্দন অথবা একই সঙ্গে বলা যাক ছন্দস্পন্দ। ছন্দ কি দেখা যায়? অদৃশ্য কিন্তু শ্রুতিগোচর এই ছন্দের প্রবাহের মধ্যে ভেসে আসে শব্দগুলি, ফলে ছন্দের নকশা অত্যন্ত সুনিয়মিত হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন অন্ধভাবে একে অন্যের গায়ে এসে লেগে যায়, অনিবার্যভাবে এসে যায়, তার দ্বারা নিপুণ সুগঠিত একটি পদ্যপঙ্‌ক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সজীব ব্যক্তিত্বের কোনো লক্ষণ তার মধ্যে প্রায়ই তখন পাওয়া যায় না। তাই এ-ও দেখা যায় যে শব্দচেতনাগত আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ইতিহাসে দেখা দেয় এক ছান্দসিক বিদ্রোহ, ছন্দোমুক্তির সাধনা। বস্তুত ছন্দের আলোড়ন শব্দের আলোড়ন একই সূত্রে বাঁধা।

মধুসূদনকেও তাই ছন্দ ভাঙতে হয়েছিল শব্দকে প্রাণ দেবার জন্যেই। এমন কী যে-শব্দপ্রকটতা তাঁর ম্যানারিজম ব'লে জানি, তার প্রেরণাও এসেছিল অমিত্রাক্ষরেরই প্রয়োজনে। চোদ্দ মাত্রার সুবিন্যস্ত লাইন ভেঙে নিয়ে কথার স্রোত যখন এগিয়ে এল স্বাধীন-মতো, শব্দগুলি যেন অনেকদিন পর একটু ন'ড়েচ'ড়ে উঠল, একটু পাশ ফিরবার জায়গা পেল, হাঁপ ছাড়তে পেল অনেকদিন পর। আভিধানিক অর্থে রঙ্গলালের যা শব্দসম্পদ তার দ্বারাও রচিত হওয়া অসম্ভব ছিল না নতুন কবিতা, কেবল যদি ক্লান্তিময় পুরোনো পদ্ধতির ঠাসা নকশার মধ্যে তিনি ভ'রে না রাখতেন তাদের।

কেবল মধুসূদনে নয়, বাঙলা কবিতায় এর পরে ক্রমিক ছন্দো-মুক্তির সাধনা দেখেছি আমরা আরো একশো বছর। রবীন্দ্রনাথকে যে পৌঁছতে হলো গদ্যকবিতা পর্যন্ত তার একটা মস্ত কারণ এই মনে হয় যে নিজের অভ্যাসের গণ্ডি থেকে মুক্তি পাওয়া তখন খুব জরুরি ছিল তাঁর। অন্তত তাঁর গদ্যকবিতা এই দাবির কোনো সমর্থন দেখায় না যে এ-রচনার বাণী অন্য কোনো নিয়মিত ছন্দপাত্রে ধরিয়ে দেওয়া

যেত না। এ নিশ্চয় একটা পরীক্ষাকাল, কিন্তু এই পরীক্ষার শোধনের মধ্য দিয়ে শব্দ যেন আবার নতুন ক'রে শক্তি পেল, শুরু হলো আরেক নতুন যাত্রা, 'প্রান্তিক' আর তার পরবর্তী কবিতাবলির মধ্যে যার স্বতঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাব।

কিন্তু ছন্দোমুক্তিরও তো শেষ আছে। সত্যি কি আছে? ছন্দকেও যদি নিছক বাইরের অর্থে ভাবি তবে তার শেষ আছে নিশ্চয়। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় অক্ষরবৃত্তের—বিশেষত আঠারো মাত্রার—যে অবিশ্বাস্য প্রতিপত্তি দেখা যায়, হয়তো তাকে ভেঙে দেওয়া গেল, কিন্তু তার পর? নানা রকমের পঙ্‌ক্তিবন্ধ, স্বতন্ত্র ছন্দোরীতি—এবং তার মধ্যে বাক্‌স্পন্দের স্থগিত প্রয়োগ—ধরা যাক গৃহীত হলো কোনো কোনো কবির লেখায়, কিন্তু তার পর? এ-ও শেষ পর্যন্ত একটা বহিরঙ্গ ভাবনায় পৌঁচচ্ছে না? কেবল যে ভিন্ন পঙ্‌ক্তিবন্ধ বা ভিন্ন ছন্দোরীতিই আবির্ভূত হতে পারে ভিন্ন কবির ক্ষেত্রে তা নয়, সেই সেই ছন্দের মধ্যেও পুরোনো রীতিকানুন কিছু পরিমাণে ভেঙে দেওয়া সম্ভব, সাম্প্রতিক কবিরা অনেক সময়ে যা করেছেন। পর্বাঙ্গবিভাগ আর চলবে কি না অথবা মধ্যখণ্ডনের কী প্রয়োজন কিংবা কোন্ ছন্দে কোন্ শব্দের কী হওয়া সম্ভব মাত্রামূল্য—এসব প্রশ্ন ভবিষ্যতের ছান্দসিককে আবার নতুন ক'রে ভাবতে হবে হয়তো, নতুন ক'রে নির্মাণ করতে হবে সূত্র। কিন্তু তার পর?

মনে হয় যে তারও পর একটা কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়, ছন্দে নয়, ছন্দস্পন্দে। যেমন দুই ভিন্ন জনের কথা বলার স্বর ঠিক একই রকম নয়, যদিও একই শব্দ হয়তো তারা ব্যবহার করে, তেমনি দুই কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য তৈরি ক'রে দেয় এই স্বর, এই স্পন্দ! অবশ্য এটা ঠিক যে ভদ্রতার কণ্ঠ একটা রীতির মধ্যে বাঁধা ব'লে অনেক সময়ে তা সুঠাম কিন্তু নির্জীব, কথা বলবার ঠিক স্বরটি জানা যায় কেবল অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলাপনে। কবিতাও খোঁজে সেই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বর। প্রথমটি যেমন ধরা পড়ে কণ্ঠস্বরের ভিন্নতায়, পরেরটি

তেমনি দেখা দেয় ছন্দস্বরের স্বাতন্ত্র্যে। অন্য ভাষায় হয়তো বলা যায় যে এই কণ্ঠস্বরের, ব্যক্তিগত ধ্বনির এই জাদুটিই সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া চাই কবিতার ছন্দের মাঝখানে। তাহলে সেখানে, একমাত্র সেখানেই, কোনো ম্যানারিজমের বাহন না হয়েও কবিতার দেহ হয়ে উঠতে পারে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব। যে শব্দশৃঙ্খলা রচিত হয়ে আছে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে, তার মধ্যেকার সংযোগসূত্রগুলিকে ছিঁড়ে আলগা ক'রে দিতে হবে বলেছিলাম। কে দেবে? কবির কণ্ঠ। প্রতি দুই শব্দের মধ্যে কবির মুখই ভেসে ভেসে স'রে যায়, তখন কোনো শব্দকেই মনে হয় না মৃত, নিছক পুরোনোও মুহূর্তমধ্যে মায়াময় নবীন হয়ে ওঠে, কোনো রকমের উগ্র লক্ষণ না নিয়েও জীবনানন্দের ভাষার মতো শব্দ তখন খুঁজে পায় একান্ত স্বকীয়তার ধ্বনি, যে-কোনো ফ্যানি তখন বুঝতে পারেন কীটসের সমস্ত এই চিৎকারে কত সত্য মূল্য আর্ত হয়ে আছে: See here it is—I hold it towards you!

সব কবিরই বুকের মধ্য থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এই হাত, সেই হলো তাঁর পবিত্রতম শব্দ।

ছন্দ : নিরূপিত ও ব্যক্তিগত

ছন্দের কি কোনো ব্যক্তিগত চেহারা আছে? অথবা ছন্দ কেবলই সর্ব-স্বীকৃত কোনো পরিমিত পুঁথিগত রূপ? শেষ উত্তরটিতে আমরা অভ্যস্ত; ছন্দ যখন বিজ্ঞান হিসেবে মান্য তখন তার স্পষ্ট কোনো মানমাত্রাও নির্ধারিত আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ো কবিরা কত-দূর পর্যন্ত এই মাত্রার দ্বারা আবদ্ধ থাকেন অথবা থাকা উচিত তা নিশ্চয় বিচারযোগ্য বিষয়। যদি ভারতচন্দ্রের পয়ারপ্রবাহে অকস্মাৎ এমন শ্লোক চ'লে আসে 'কান্দে রানী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে / নখে নখ বাজায়ে নারদমুনি হাসে' তখন তার এই ৭+৭ বিভাগের ব্যতিক্রমকে কি ছন্দপরিমাপের দিক থেকে স্খলনই বলব, নাকি বলব পরিমিতিলঙ্ঘী ব্যক্তিগত ছন্দের টান? হঠাৎ সাতের তালে নাচিয়ে না দিলে নারদমুনির নখবাজানো আমরা শুনতে পেতাম কিনা সন্দেহ এবং সেইটে মনে রাখলে একে কেবল কবির খামখেয়াল অথবা অন্যমনস্কতা ভেবে স্থির থাকা অসমীচীন হয়।

আবার আরেক দিক থেকে কথাটি বিবেচনা করা যায়। বাইরের কাঠামো থেকে কবির অভিপ্রেত পাঠ্য ধরন বিষয়ে সব সময়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি তাই তার অর্থবোধেও যেমন আমাদের খানিকটা সাহায্য করে, তেমনি সহজতর হয় তার প্রচ্ছন্ন ছন্দ-রূপের আবিষ্কার। কবিকণ্ঠে যাঁরা 'বীরপুরুষ' অথবা 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতার রেকর্ড শুনেছেন, তাঁরা মনে করতে পারবেন যে পর্ব-ভাগের বিধিমতো কৌশল সেখানে সূচনায় খানিকটা নিরর্থক হয়ে

যায়। 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে', দ্রুত এই কাটা-কাটা শব্দগুলি সূত্রপাতে যেন ধাবিত হয়ে আসে। পাঠানুগ ছন্দ-রূপ তৈরি করলে প্রথম লাইনদুটি হবে এ রকম: 'মনে করো যেন/বিদেশ ঘুরে/ মাকে নিয়ে/যাচ্ছি অনেক/দূরে।' কিন্তু ছন্দের প্রচলিত নিয়মে সবাই জানি এর কাঠামোটা এই, 'মনে করো/যেন বিদেশ/ঘুরে/মাকে নিয়ে/যাচ্ছি অনেক/দূরে।' অথবা 'ভ্রষ্টলগ্নে'র প্রথম লাইনেই 'শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে' এর ছ'মাত্রার চল্‌তি ধরনটা ভেঙে যায়, কবির গলায় হয়ে দাঁড়ায় যেন তিন মাত্রার পর্ব: 'শয়ন/শিয়রে/ প্রদীপ/নিবেছে/সবে' (এখানে স্মরণীয় যে ছ'মাত্রার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলতেনও তিন মাত্রার)। অর্থাৎ পুঁথিগত পরিভাষায় বলা যায় যে প্রতি পর্বার্ধে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন পর্বের টান, ফলে এই তাঁর বিশেষ ছন্দকে শোনায় যেন পৃথক কোনো চালের অন্তর্গত।

অর্থের বিবেচনায় 'মনে করো/যেন বিদেশ/ঘুরে' রূপের চেয়ে 'মনে করো যেন/বিদেশ ঘুরে' সার্থক, সংগত। কিন্তু ছন্দোবিজ্ঞানীর পক্ষে সেকথা বলার উপায় নেই কোনো। ছন্দোবিজ্ঞানী কঙ্কালবিলাসী, তাঁকে তাই কাঠামো মাত্র জেনে নিতে হয়। বুদ্ধদেব দিলীপকুমারকে ঠিকই আক্রমণ করেছিলেন যে, 'মরি মরি অ/নঙ্গ দেব/তা' হিসেবে কবিতাপাঠ দিলীপ ভিন্ন আর কারো পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। দিলীপ-কুমার রায়ের ঐ ছন্দোলিপি সংশয়হীনরূপে শুদ্ধ, কিন্তু কবিতা-পাঠক ঐ শুদ্ধিকে অবহেলায় অতিক্রম ক'রে যান এবং বলেন 'মরি মরি/অনঙ্গ দেবতা।' এ-রকম ছন্দোলিপিতে হয়তো পুঁথিগত ছন্দ-দোষ আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু কান এই ছন্দোগত ত্রুটিতে বিশেষ বিপন্ন বোধ করে না। কবির দায় ভাষা বানানোর, ব্যাকরণ বানায় অন্যে।

সম্প্রতি-প্রচারিত একটি ব্যতিক্রমের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে এদেশে আধুনিক কবিতার রেকর্ড দুর্লভ। এবং অসিলোগ্রাফের সাহায্যে কবিতাপাঠের কোনো লেখরচনা এখনো এখানে চল্‌তি হয়নি।

কিন্তু বিগত দশক জুড়ে বিভিন্ন কবিসম্মেলনে কবিকণ্ঠে আবৃত্তি শোনাবার অভ্যাস দেখা দিয়েছে। তার দ্বারা আর কিছু না হোক, কবির ব্যক্তিগত ছন্দ-অভিপ্রায়ের কিছু আভাস হয়তো পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালের সেনেট হলে যাঁরা শুনেছেন সুধীন্দ্রনাথের বেশ জোরের সঙ্গে পর্বে পর্বে ঝোঁক দিয়ে পড়া 'তুমি বলেছিলে/জয় হবে জয়/হবে—' তাঁরা অনুমান করতে পারবেন যে গদ্যকবিতার প্রতি এই কবির আগ্রহ খুব প্রবল হবার নয়; এবং অন্যপক্ষে জীবনানন্দের আপাত-ভীরু কণ্ঠস্বরে যে খসখসে টানা আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল তাতে গদ্যস্পন্দের প্রতি তাঁর আগ্রহকে অনেক সহজাত ব'লে মনে হতে পারত। আবার অসংখ্য গৌণ কবির একই ভঙ্গিমাজাত পাঠপদ্ধতি বস্তুত একই ফ্যাশানে আবর্তিত ছন্দ-রূপের কৌশল যেন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সেখানে প্রায় ধরা পড়ে না। অর্থাৎ ছাপার অক্ষরে কবিতাকে কেবল নিরূপিত ছন্দের দিক থেকে বিচার করি, কিন্তু তারই সঙ্গে জড়ানো ব্যক্তিগত ছন্দ কিছু আছে কিনা তার সন্ধানও সম্ভব হয়ে ওঠে কবির নিজের গলায় কবিতা শুনলে। বিষ্ণু দে গদ্যকবিতা বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'আবেগই শুধু এ ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে নাও চলতে পারে।' এই উক্তি যথার্থ এবং ছন্দকবিতার বিপরীত লক্ষণ হিসাবেই বিষ্ণু দে বলেন এ কথা। কিন্তু ব্যাপকতর বিবেচনায় হয়তো মনে করা যায়, যে-কোনো কবিতা প্রসঙ্গেই উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে না চললে ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও সূক্ষ্ম প্রভেদ সঞ্চারিত হতে থাকে, ফল্গুস্রোতে দেখা দিতে থাকে অনতিলক্ষ্য এক ব্যক্তিগত ছন্দ।

বাঙলা ছন্দের একটা মুক্তিপথ হয়তো এই ব্যক্তিগত ছন্দের প্রবর্তনায়। 'বীরপুরুষ' বা 'মদনভস্মের' মতো ক্ষণচকিত আবিষ্কার নয়, অথবা জীবনানন্দের মতো কোনো কোনো কবিকণ্ঠে যেমন একটা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় দ্যোতিত হতে থাকে তেমনও নয়, এই আবিষ্কারের

প্রেরণা কণ্ঠরূপ থেকে ছন্দ-রূপ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া দরকার। মুদ্রণের সুযোগ নিয়ে উনিশ শতকের বাঙলা ছন্দ যে ক্রমশ একটি সুপরিমিত রূপ পাচ্ছিল, গঠনপর্বে অবশ্যই তার ভূমিকা ছিল মূল্যবান। কিন্তু বর্তমান শতাব্দী ধীরে ধীরে এর বন্ধনমোচনেরও দায়িত্ব নিতে চায়। আয়াম্বিক প্রমুখ ছন্দ-নামগুলিতে বর্তমান দিনের ইংরেজ সমালোচক স্বভাবত যে ক্লান্তি বোধ করেন, মাত্রাবৃত্ত জাতীয় নাম প্রসঙ্গে বাঙালি সমালোচকের অশ্রদ্ধা এখনো তত প্রবল নয়—এমন-কী নামগুলি আলোচনাজগতে এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট হতে পেরেছে ব'লেই দাবি করা যায় না। কিন্তু তরুণতম কবিমহলে এর বিরুদ্ধে যে চাপা অস্বস্তি গুঞ্জরিত হতে শুরু করেছে তাকে ঐতিহাসিক লক্ষণ ব'লে গণ্য করাই ঠিক। ছোটো এক সভায় বুদ্ধদেব বসু অল্পদিন আগে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে এখনকার কবিরা ছন্দ ঠিক লেখেন না। কথাটায় অধৈর্য এবং অবিবেচনা ছিল। প্রচলিত ছন্দ-রূপ এঁরা কখনো (কেউ বা প্রায়শ) অমান্য করেন ঠিকই, কিন্তু সে কি অক্ষমতাবশত অথবা শ্রদ্ধার অভাবে তা ভেবে দেখতে হবে। দেশ-বিদেশে সকলেই আজ পুরোনো ছন্দের মাপা ব্যবহারে ক্লান্ত, কবিরা প্রায়ই বেরিয়ে আসতে চান এই আড়ষ্ট নিপুণতাকে ভেঙে দিয়ে।

এর অর্থ কি তবে গদ্যকবিতায় পৌঁছনো? সব সময়ে তা নয়। গদ্যকবিতাকে বলা চলে মুক্তিসন্ধানের এক উলটো পথ। এ-ও ব্যক্তি-গত আবেগের তাপে নিয়ন্ত্রিত বটে, কিন্তু এর ছন্দের যে প্রবাহ তা আন্তরিকরূপে গদ্যেরই। অন্যপক্ষে, আধুনিক মুক্তিব্রতীকে মনে রাখতে হয় যে হার্বার্ট স্পেন্সরের পরিহাসবাক্য সর্বতোভাবে যোগ্য ছিল না, গদ্যের মার্জিন মুছে দিলেই তা পদ্য হয়ে ওঠে না। বস্তুত গদ্যকবিতাকে গদ্যের মতো সাজানো হবে কি পদ্যের মতো, সে খুব গৌণ প্রশ্ন; স্পন্দিত গদ্য এবং গদ্যকবিতার ছন্দ স্বতন্ত্র হলেও তাদের আত্মীয়তা কোথাও ধরা পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত ছন্দ—যার অপর নাম নিশ্চয় মুক্তছন্দ—গদ্যের মতো সাজানো থাকলেও তার থেকে

ধরা যাবে পদ্যছন্দের মেজাজ, যদিও ইস্কুল-বইয়ের আলংকারিক ছন্দে কবির বিমুখতা থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক সাম্প্রতিক একটি কবিতার লাইন: "যদি বলো 'সারাৎসার' মেনে নেব—যদি বলো 'সহমরণ' আমি শুধু আঙুল নির্দেশ করে দেখাব তোমাকে সপ্তদশ শতাব্দীর নৌচালনার ম্যাপ" (উৎপলকুমার বসু)—গদ্যের চেহারা হলেও এর অক্ষরবৃত্ত চরিত্র লুকোনো থাকে না, অথচ সেই কারণে 'সহমরণ' কিংবা 'নৌচালনার ম্যাপ' লিখতে কবি ইতস্তত করেন নি; তেমনি 'ছিল আঠার/উনিশ মাইল টিকিট অথচ বেড়ালাম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হলো'গ্র-এ গদ্যও নয়, অতিনিরূপিত কোনো ছন্দও নয়—কিন্তু দুয়েরই সুযোগ এর মধ্যে সমানভাবে আত্মসাৎ করা সম্ভবপর ব'লে মনে হয়।

সন্দেহ নেই যে এমন অভ্যাসের বিপদ অনেক। অব্যবসায়ীর প্রতাপে আঙিনা ভ'রে যাবে, এই ভেবে বিলাপ হতে পারে। কিন্তু যে কোনো যুগে কবিতাসংসারে অকবির সংখ্যা এতই প্রভূত হয়ে থাকে যে তা নিয়ে দুর্ভাবনা নিতান্ত শৌখিন বিলাস। গদ্যকবিতার আদি পর্বে কেউ-বা আশা কেউ-বা আশঙ্কা করেছিলেন, এবার তবে সবাই বুঝি কবি। সে আশঙ্কাতে কবিতা যেমন রসাতলে যায় নি তেমনি ছন্দোমুক্তির আধুনিক নূতন প্রয়াসেও যে সর্বনাশ ঘনাবে—এতটা মনে হয় না। বরং অভ্যাসের গণ্ডী ভেঙে নিরূপিত ছন্দ ব্যক্তিগত ছন্দের নিত্য দ্বন্দ্বরচনায় যথার্থ কবি উত্তেজক নূতন দিগন্ত দেখতে পাবেন বলেই আজ ভরসা করা যায়।

ছন্দোহীন সাম্প্রতিক

Remember skilled verse is dead in fifty years : Lawrence/1913

সত্যোযুবা কবিযশঃপ্রার্থীদের কথা হচ্ছিল সেদিন, শরৎবাবু,[১] আমরা দুঃখ করছিলুম এঁরা ছন্দে লেখেন না ব'লে। মনে পড়ে? তার পর থেকে কিন্তু কথাটা ভাবতে একটু মজা লাগছে আমার। ভেবে দেখুন তিন বছর আগে একটি সভায় বুদ্ধদেবও বলেছিলেন অসীম হতাশায়, সাম্প্রতিকের বিরুদ্ধে তাঁর অন্যতম অভিযোগ তাঁরা ছন্দ জানেন না। কেবল বুদ্ধদেব নন, এমন-কী সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটু ইতস্তত করেন আজকাল, এখনকার প্রতিষ্ঠিত তরুণদের রচনায় ছন্দ থাকছে কি না, ভেঙে পড়ছে কি না কোথাও কোথাও—এ নিয়ে তাঁরও যেন কিছু দ্বিধা দেখতে পাই। আবার ইতিহাসের পরিহাস ভাবুন, এইসব উত্তর-রবীন্দ্র খ্যাত কবি সাধারণ্যে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় কীভাবে পরিচিত? ছন্দে-মিলে সাজানো দিব্যি একটি কবিতা পড়েও সবাই কেমন ক্ষমাশীল মাথা নেড়ে বলেন: 'ভালো, কিন্তু এঁরা ছন্দে লেখেন না কেন?'

ভেবে কি আক্ষেপ হচ্ছে যে ব্যাপারটা কেবল বাঙলা দেশেই সম্ভব? অন্তত আমার সেইরকম মনে হতো অনেকদিন পর্যন্ত। মনে হতো যে 'প্রান্তিকে'র কবিতা প'ড়ে তার অন্ত্য-মিলে মুগ্ধ হওয়া অথচ জীবনানন্দের কোনো রচনাতেই ছন্দ-মিল খুঁজে না পাওয়া কী নিদারুণ মানসিক অবসাদের চিহ্ন! 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্যে'র কবিতা

১ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অথবা ধরুন 'কিনু গোয়ালার গলি'কে গদ্যছন্দ ভেবে দিনের পর দিন খুশি থাকা কতটাই দেশীয় নিশ্চেতনার লক্ষণ! আত্মগ্লানির এদিকটা অবশ্য আপাতত কেটে যাচ্ছে, কেননা এডিথ সিটওয়েলের একটি লেখা থেকে অনুমান করছি এ-দুর্ভাগ্য কেবল আমাদের একারই নয়। সিটওয়েল দুঃখ করেছেন এই ভেবে যে, তাঁদের প্রথম যৌবনে যা-কিছু তাঁরা লিখতেন তা কেবলই আক্রান্ত হতো ছন্দোহীনতার অপবাদে, মিলবিন্যাসের অক্ষমতায়। তুলনা করে হয়তো বলা হতো টেনিসনের নাম, তাঁর এমন সব কবিতা যার মধ্যে সত্যি কিন্তু মিল নেই; আর আশ্চর্য এই যে সিটওয়েলদের নিন্দাস্থল সেই কবিতাবলি প্রায় সব সময়েই ছিল ছন্দে-মিলে ভরাট।

অতএব পাঠক বিষয়ে এই মুহূর্তে দুঃখ করে লাভ নেই। তাঁদের অভ্যাসের সময় দিতে হবে এবং তাঁদের সমস্ত অভিযোগ আপাতত চুপ ক'রে শুনতে হবে। কিন্তু কবিই যখন প্রশ্ন তোলেন কবির বিষয়ে, তখন গূঢ়ভাবে আত্মসন্ধান করবার প্রয়োজন হয়। ভাবতে হয়, আজ যদি সদ্যতনেরা এই ব'লে প্রসাদ লাভ করেন যে ছন্দকে এলোমেলো ক'রে দেবার অভ্যাস তাঁরা শিখেছেন আপনাদেরই কাছে? যদি বলেন যে এই নিরাসক্ত নিশ্চেতনা তাঁদের কেবল উত্তরাধিকারে পাওয়া? আপনারা কি সত্যিই এমন কিছু রেখে যাচ্ছেন যার দ্বারা উভয়তোমুখ এই আক্রমণের দায় এড়াতে পারবেন? অতীত-ভবিষ্যতের সমান তর্জনী আপনাদের জন্য উত্তোলিত থাকছে তা কি ধরতে পারছেন?

কিন্তু তার আগে বুঝে নিতে হবে কাকে বলে ছন্দ-জানা। কবিকে কি ছন্দ জানতে হবে যেমনভাবে জানেন সেন্‌স্‌বেরি বা প্রবোধচন্দ্র সেন? লরেন্স তাঁর একটি চিঠিতে বলেছিলেন, প্রাচীন গ্রীক রোমান কবিরা কবিতার ঠিকমতো পর্বভাগ করতে জানতেন কিনা সন্দেহ। হতেও পারে যে জানতেন না। এমন-কী শেলির কবিতা যখন পর্বে পর্বে মিলিয়ে পড়তে শিখলেন লরেন্স, তখনই তাঁর কবিতাপাঠের

উত্তেজনা গেল চ'লে—এও খুব সম্ভব। আমরা অবশ্য বিপরীত উদাহরণ বলব রবীন্দ্রনাথের, যেমন তিনি বলেছিলেন, 'অহহকলয়ামি-বলয়াদিমণিভূষণম্' পদটি ঠিক-ঠিক যতির সাহায্যে পড়তে শিখেই তিনি জানলেন জয়দেবের মাধুর্য,—কিন্তু সে কেবল সংস্কৃত পদপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের জন্য, কেননা স্বভাবত নিশ্বাস নেবার জন্য কোন্ জায়গাটা খুঁজে নেব ঐ দীর্ঘ শব্দবন্ধে? কথাটা এই যে, কবিতার সুর বুঝবার জন্য যেমন ছন্দের তত্ত্ব অথবা তথ্য-জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়, কবিও তেমনি না জানতে পারেন ছন্দ-বিশ্লেষণের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ধরন। জানলে ভালো; কিন্তু জানলেও দেখি কবির ছন্দ-ভাবনা আর ছান্দসিকের ভাবনা চলে ঈষৎ পৃথক পথে, কেননা কবি রচনার ভিতর-অভিজ্ঞতা থেকে জানেন সমস্ত ব্যাপারটা। রবীন্দ্রনাথ, যিনি অন্য অনেক কিছুর মতো বাঙলা ছন্দশাস্ত্রেরও অন্যতম প্রবর্তক ব'লে গণ্য, সেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তাও কি বিজ্ঞানবিচারে অমূল্যধন বা প্রবোধচন্দ্রের চেয়ে প্রামাণিক?

কবির ছন্দ-জানা তাহলে অনেকটাই শ্রুতিনির্ভর, কোনো কোনো সময়ে হয়তো অশিক্ষিতপটুত্ব। এখানেই বিপদসম্ভাবনার সূত্রপাত। যদি দেখা যায় এই পটুতা তাঁকে স্থিরনির্দিষ্ট ছন্দকাঠামোর অন্তর্বর্তী ক'রে রাখছে, তাহলে কবি আর পাঠকের বোধে বিরোধ ঘটে না বড়ো, কিন্তু কবি যদি মনে করেন তিনি এর বাইরে আরো কোনো ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে? যদি তাঁর মনে হয় যে প্রচলিত নিরূপিত ছকটিকে ভেঙে দেবার দরকার হচ্ছে কিছু? পাঠক তাঁকে দেবেন না সেই স্বাধীনতা? ছন্দের বিশৃঙ্খলা নয়, কিন্তু ছন্দের প্রসারণ কি চাইবেন না কবি? পাঠকের রায় চিরাচরিতের পক্ষে, অভ্যাসের অনুকূলে, কেননা তা নইলে তাঁর কান সহজে খুশি হয় না। তখন হয়তো ঈষৎ-বিরক্ত ঈষৎ-অভিমানী ভাবে আপনারা বলবেন, লরেন্সের ধরনে, 'Well, I don't write for your ears'!

আধুনিক কবির পক্ষে একথা ভুলে থাকা সম্ভব নয় যে ছন্দের সমস্যা আসলে ব্যক্তিত্বেরই সমস্যা, সে তো কেবল ছান্দসিকের শুকনো পুঁথি নয়। ব্যক্তিরই মুক্তির জন্য ছন্দের ক্রম-উন্মোচনের প্রয়োজন ঘটে, দরকার করে তার অনড় চলৎশক্তিহীনতার বাইরে বেরিয়ে আসা। কবি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমিটিকে 'কারো জন্য কোনো মার্জিন না রেখে' (যেমন একটি চিঠিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) ছড়িয়ে দিতে চান, তাঁর ব্যক্তিগত স্পন্দনকে সঞ্চারিত করতে চান ছন্দশরীরে। এই সঞ্চারের জন্যই কখনো কখনো মুক্তি খোঁজেন কবি।

কিন্তু মুক্তি মানে তো যা-খুশির অবহেলা নয়। যার ব্যক্তিত্বই প্রস্তুত নয় সে কেমন ক'রে জানবে কাকে বলে মুক্তি? কীই-বা মুক্তিপণ? ছন্দকেও গ'ড়ে তুলতে পারলে তবেই তাকে ভাঙা যায়, গড়তে যিনি জানেন না ভাঙবার কোনো অধিকারও তাঁর নেই। তখন কবিকে মনে রাখতে হয় যে বাইরে ছড়ানো উপাদান উপকরণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর যুদ্ধ, এক-একটি কবিতা লেখা অনেক বিরূপতার মধ্য দিয়ে এক-একটি যুদ্ধের সমাপন। 'ছিলাম বাসনালঘু, ছন্দ এসে আমাকে সংযমী হতে বলে' : এই পরামর্শের জন্য যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বয়স্ত' ব'লে তর্জন করেন ছন্দকে, তবু তাকে ছাড়তেও পারেন না, ছাড়েন শুধু তার অনায়াস-মসৃণতা। যদি বলা যায়, ছন্দে লিখব না কেবল এই জন্যে যে ছন্দোহীন লিখতে পারলেই অনেক খোলা ভাবে কবিতা লিখতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে আপনি আর লড়াইয়ের মধ্যে নেই, আপনি পালিয়ে গেলেন অনেক আত্মপরীক্ষার দায় এড়িয়ে। এটা ঠিকই ভয় হচ্ছে যে সদ্যতনের দল অনেক সময়ে জানতেই পারছেন না কোথায় আছে পরীক্ষা, কিন্তু আপনারা, যাঁরা এই পনেরো বছর বাঙলা কবিতায় তরুণ নামে চিহ্নিত ছিলেন, আপনাদের সামনে এই আত্মপরীক্ষার প্রশ্ন কি কিছু ছিল? হতে পারে যে প্রশ্ন এবং পদ্ধতি সবার সমান নয়, আলোক সরকার আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা

অলোকরঞ্জন এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার মৌলিক লক্ষ্য বিষয়েই এত স্বতন্ত্র ভাবনাজগতে বাস করেন যে ছন্দোমুক্তির ভাবনাও এঁদের পৃথক পথে হওয়াই সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ কোনো ভাবনা ছিল কি?

কেন পূর্বতনেরা লক্ষ করেন নি এই ভাবনা, কেন তাঁরা প্রত্যাহত বোধ করেন সাম্প্রতিক কবিতার ধ্বনিপ্রবাহে? 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ' লাইনটির যদি অক্ষর-বৃত্তে ব্যবহার হতো, তবে কি একে মনে হতো পতিত? আলোক সরকার এমন-কী অলোকরঞ্জনের রচনাকেও কি কারো মনে হতে পারে ছন্দ বিষয়ে অসতর্ক? আধুনিক ছন্দের ইতিহাস ছন্দশরীরে বাক্‌স্পন্দকে আত্মীকরণের ইতিহাস; এই বাক্‌স্পন্দকে আয়ত্ত করবার ভিন্ন ভিন্ন পথ যে খুঁজছিলেন এই কবিরা—সেইটেই কি দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আমাদের? তারই এক প্রবল প্রবর্তনায় যেমন পঁচিশ বছর আগে সম্ভব হয়েছিল 'পদাতিক', যেমন অক্ষরবৃত্তের শোষণচাতুর্যের আশ্চর্য ব্যবহার করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর হাজরা পার্ক বা খিদিরপুর-এর মতো আয়তনকে চার মাত্রার আয়ত্তে এনে, তারই সংগত পরিণাম হিসেবে 'তুই এসে' আজ কত অনায়াসে তিন মাত্রায় গণ্য হতে পারে। এর জন্য এ-অংশের দ্রুত কৃত্রিম উচ্চারণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। 'পদাতিকে'র পর এই প্রক্রিয়া থেমে থাকে নি, এক সময়ে এই শব্দসংশ্লেষের নিপুণ ব্যবহার করেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। সংশ্লেষ-বিশ্লেষের যুগল ভঙ্গিতে অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনা আজ কবিদের কাছে অনেকটাই খোলামেলা।

বিশ্লেষের কথাটা যখন উঠল, ব'লে নেওয়া ভালো। 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার কয়েকটি লেখায় ছন্দ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল মনে হয় অক্ষরবৃত্তের এই বিশেষ স্বভাবকে তত স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কেন নন? 'বিকেলে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ': সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই

'প্রত্যহ' উচ্চারণ হয়তো তাঁর সমর্থন পাবে শব্দটি অন্তে আছে ব'লে, ভেঙে দেওয়া যায় ব'লে। কিন্তু 'বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্য-ক্ষেত/দুলিয়া উঠিল যেন শীর্ষ সমেত' এর 'শীর্ষ'-ব্যবহারটি রবীন্দ্রনাথ কোন্ দিক থেকে মেনেছিলেন? সন্দেহ নেই যে অক্ষরবৃত্তের চরিত্র সংশ্লেষেরই পক্ষপাতী, কিন্তু বাঙলা উচ্চারণ এতটা স্থিতিস্থাপক, অতিনির্দিষ্ট অ্যাকসেন্টের অভাবে এতটা নমনীয় যে কখনো কখনো প্রয়োজনমতো 'শীর্ষ' বা 'প্রত্যহে'র মাত্রা বাড়িয়ে নেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব। কবিকে কেবল জানতে হবে যে এর প্রয়োগ যদি অতিসীমিত না হয় এবং অতিসচেতন অভিপ্রায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে ক্রমশ এক নীরক্ত নির্জীবতায় আচ্ছন্ন হতে পারে তাঁর সমগ্র রচনা।

এইটে মনে রাখলেই বুঝতে পারা যায় কেন অলোকরঞ্জন লেখেন 'মগডালে বসে-থাকা পাপিয়াকে আর/পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন' অথবা উৎপলকুমার বসু বলেন 'রুয়ার বিবাহে আমি যাব বলে উঠেছি এবার নিশিধাক্কার ঢেউয়ে ত্রস্ত হয়ে' বা 'স্বাতীনক্ষত্রের ঈর্ষা হলে—ধর্মপত্নীর প্রতি ঈর্ষা হলো রক্ষিতার নানাবিধ'। পর্যবসিত, ধর্মপত্নী অথবা নিশিধাক্কা এখানে একটু বেশি জায়গা ক'রে নেয়, ছন্দ ট'লে পড়তে পড়তেও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। আপনার মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, অক্ষরবৃত্তে 'ঐ' শব্দটির প্রয়োগ বিষয়ে। আমাদের উচ্চারণক্রমেই এক-একটি শব্দ এভাবে টান খেয়ে যায় কখনো কখনো, কবিই বা কেন নেবেন না তার সুযোগ?

অক্ষরবৃত্তে সমস্যা কেবল একটিই নয়। একে তো পয়ার মহাপয়ারের মাপ ভাঙতে ভাঙতে জীবনানন্দই তাকে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন অনেকখানি, আর এখন অনেক সময়ে বাইশ বা ছাব্বিশ মাত্রার আয়তনেও ধরতে পাই না তাকে, প্রয়োজনের খুশিতে এখনকার কবিতা লাইনটিকে খুলতে খুলতে নিয়ে যায় আরো অনেক

দূর, যেন সমস্ত স্পেসটাকে ধরবার জন্য—অথবা হঠাৎ প্রথাচ্ছেদ ক'রে তাকে টেনে রাখে কখনো বারো, ষোলো বা কুড়ি মাত্রার খণ্ডতায়। আবার অন্যদিকে উপপর্বের সমস্ত দায় লঙ্ঘন ক'রে, মধ্যখণ্ডনের নানা ভঙ্গিতে, তার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে নেয় কথ্য চাল। এই পদ্ধতি আজ নূতন নয়, অন্তত বিষ্ণু দে'র কবিতাতেই এর ব্যবহার আছে সাহসিক ভাবে। সেইজন্যে কি অনেক সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অস্বস্তি বোধ করেন তাঁর ছন্দপ্রবাহে? বাইশ মাত্রার পয়ারচালে অলোকরঞ্জনের এই সব প্রয়োগ 'আমি একটা পাথরে বসেছিলাম। সূর্য অস্তের গোধূলিতে' অথবা 'গোধূলির কনকনখদর্পণে দেখা হয়ে গেছে' কীভাবে মাত্রাবোধ যথাযথ রেখেও আলতো কথার উচ্চারণ তুলে আনে, তা ঠিকমতো লক্ষ করতে না পারলে কারও-বা মনে হতে পারে একে ভুল ছন্দ। আর এ-পদ্ধতি যে একা অলোকরঞ্জনেরই তা নয়, সমস্ত লাইনটিকে এইভাবে এক মুঠোর মধ্যে ধরতে চাইবার ইচ্ছে সাম্প্রতিক একটি লক্ষণ মাত্র।

সবাই ধরতে জানে না অবশ্য। সেইজন্যেই বাঙলা ছন্দ এতদিন অক্ষরবৃত্তে মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে একটা অন্ধ গলির মধ্যে চ'লে যাচ্ছে কখনো-বা। তারাপদ রায় যে পরিহাস ক'রে বলেন অনেক সময়ে, কথা বললেই পয়ারে গেঁথে ফেলা যায়, সেটা সম্ভবপর সত্যি। কিন্তু এই সম্ভবপরতাই হচ্ছে বিপজ্জনক, এই সম্ভবপরতাই অসতর্ক কবিকে একটা রুদ্ধ বৃত্তের মধ্যে এনে দেয় আর প্রায় অচেতন ভাবে কবিতা লিখিয়ে নেয়। অনায়াস এই ভঙ্গিমা থেকে বেরিয়ে আসবার একটি পথ খোলা ছিল স্বরবৃত্তের ব্যবহার। জীবনানন্দ ভাবছিলেন এক সময়ে, স্বরবৃত্তের দিক থেকেই বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ কি না; রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন তাঁর আগে। বহুদিন পর্যন্ত এর সংগত কোনো পরীক্ষা ছিল না আধুনিক কবিতায়, কিন্তু হঠাৎ মনে হয়, এই চার-পাঁচ বছরে স্বরবৃত্তেরও উচ্ছলতা কিছু এলো।

প্রথম পর্যায়ে 'উচ্ছলতা' শব্দটিই ব্যবহার করা ঠিক। আপনার

মনে থাকবার কথা, আপনি নিজেই কিছু ব্যবহার করেছেন এই ছন্দ, ছড়ার চালে। তাই ব'লে আপনার 'পুতুলের জন্য ছড়া' নিশ্চয় ছড়ার ছন্দ নয়, আজকাল অনেকেই দেখি চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তকে ছড়ার ছন্দ ব'লে ভুল করেন, যেমন ভুল করেন স্বরবৃত্তকে পাঁচ মাত্রার ছন্দ ব'লে! বরং 'চন্দ্রালোক' কবিতায় যেভাবে কৌতুকে-বেদনায় আপনি মিলিয়েছেন দুই ভিন্ন জগৎকে, 'ফুলদানিতে ফুল ছিল / চন্দ্রার রূপ খুলছিল / নীল আলো তার কামরাঙা বেডকভারে'—তা ছন্দ হিসেবেও মনে রাখবার মতো। এ-রকম কিছু কাজ করেছেন অরবিন্দ বা তারাপদ অথবা 'বিভাবতী বিলাপে'র সুধেন্দু মল্লিক। এ-সবের মধ্যে একটা উচ্ছলতাই আছে, খুশি করবার ধরনটা এর একেবারেই চাপা থাকে না। কিন্তু এর থেকে মনে হয় না নূতনতর কোনো পথের সম্ভাবনা হবে। সে সম্ভাবনা আছে বরং স্বরবৃত্তের আরেক ব্যবহারে, যা দেখতে পাই আলোক সরকার বা অলোকরঞ্জন অথবা সম্প্রতিকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায়। স্বরবৃত্তের সাবেকি চাল সরিয়ে নেবার ব্যাপারে আলোকের নৈপুণ্যই দৃষ্টান্তস্থল, হয়তো-বা তাঁর এই কৌশলটি বুঝতে না পারার জন্যেই অনেকে ধরতে পারেন না তাঁর ছন্দ। 'ভালোবাসাই তাদের স্থির প্রতিচ্ছবি চিরদিনের শ্যামলিমায়' এ-সব ভঙ্গি হলো অভ্যস্ত, কেবল প্রসারিত পঙ্‌ক্তির মায়ার বেশি আর কিছু নয়, কিন্তু যখন তিনি লেখেন 'চোখের কোমল যেন নদীর প্রবাহিত সরলতা, স্বাভাবিকতা' তখন শেষ শব্দটি হঠাৎ পাঁচ মাত্রায় আলগা ক'রে খুলে নেয় লাইনটির মুখ, ছান্দসিকের বিপদ ঘটে। বিপদ বাড়তে থাকে ক্রমশ—'আমি তাকে চিনতে পেরেছিলুম এই আনন্দ' অথবা আরো 'অভিমানী স্তব্ধতায় মেঝের উপর ছড়ানো তীব্র চুল।' অনেক শুদ্ধ লাইনের মধ্যপরিসরে সহসা এ কি অক্ষমতার লক্ষণ? ছন্দ না-জানার? অনুরূপ প্রয়োগের বহুলতা মিলিয়ে দেখলে জানা যায় যে এ-সব স্পষ্টই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নতুন স্পন্দ সঞ্চারের আগ্রহে তৈরি।

'চিনতে পেরেছিলুম'-এর মধ্যে রহস্য আছে মধ্যখণ্ডনের, কিন্তু 'ছড়ানো তীব্র' যে অসুবিধে আনে তার মূল আছে ছন্দচারিত্রেরই পরিবর্তনে।

দিলীপকুমার রায় একরকম ছন্দের কথা ভেবেছিলেন, যাকে নাম দেওয়া যায় 'স্বরাক্ষরিক ছন্দ'। আলোকের এই ধরনের প্রয়োগ হয়তো একবার সেই স্বরাক্ষরিকের নাম আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আধুনিক পাঠক বা আধুনিক ছান্দসিককে যেমন জানতে হবে যে স্বরবৃত্তে ইচ্ছেমতোই টেনে আনা যায় পাঁচ মাত্রার ব্যতিক্রমী পর্ব, ঠিক সেইভাবে তাকে জেনে নিতে হবে যে এ-ছন্দের একটা পথ খোলা আছে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিতে চ'লে যাবার দিকে, অ্যাকসেণ্টের চাপ সরিয়ে দিয়ে তাকে স্বভাবভঙ্গিতে বলবার দিকে।

এই স্বভাবই হলো আসল কথা। একে খুঁজবার জন্য কেউ অক্ষরবৃত্তে কেউ স্বরবৃত্তের মধ্যেই নানারকম পথ ক'রে নেবার কথা ভেবেছেন, কেউ তার থেকে স'রে যেতে চেয়েছেন গদ্যস্পন্দে। এরও মধ্যবর্তী একটা চেহারা ধরা পড়ে অনেক লেখায়, কখনো উৎপল কখনো-বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেমন ব্যবহার করেন, যাকে হয়তো বলা চলে মুক্তছন্দেরই একটা আভাস। এ-সব কবিতার মধ্যবর্তী কোনো লাইন হঠাৎ ছন্দ থেকে গড়িয়ে আসে অছন্দে, অথবা গদ্যের ঋজুতার মধ্যেই হঠাৎ এনে দেয় এক-একটা ছন্দোময় ধারা 'তোমাকে পরিয়ে দেবে—তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাথ বদল হয়'—আর তার পরেই 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে।' ছন্দকে তখন ইচ্ছে ক'রেই শক্তি টাল খাইয়ে দেন। ইচ্ছে ক'রেই পাকা ছন্দকে হঠাৎ কবি ভেঙে দেন বিরক্তিভরে, যেমন সুনীল :

> সে আমার হাত ধ'রে স্ফটিক বর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
> টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
> সকল ছন্দের মধ্যে এই সেই গায়ত্রী, তুমি নাও,—

মাত্রাহীন-এই আঙুল তুলে ধরা সাম্প্রতিক দিনের একটা দিক-নির্দেশ মাত্র।

অলোকরঞ্জন সত্ত্বেও একথা তাই স্বীকার করতে হবে যে ছন্দের প্রসাধনকলা এখনকার কবিতায় খুব চাপা, ছন্দকেই চিহ্নিত ক'রে নিয়ে নতুন কবিদের কোনো খ্যাতি ছড়ায় নি আজ। আমাদের অল্প বয়সে মঙ্গলাচরণের 'হিমাচল আসমুদ্র রুদ্র' অথবা 'ছেড়ে এলুম তোমায় ছেড়ে চলে এলুম' যেভাবে গুনগুনিয়ে উঠতে পারত মনে, কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'আরো কতোকাল সন্ধ্যাসকাল লেখালেখা খেলা খেলতে বলো'র মতো রচনাবলি, সে-রকম স্পষ্ট ঝংকার ব্যবহার করতে এখন আর কেউ তত ইচ্ছুক নন, ওঁরা নিজেরাও নন। কেননা ঐ-সব ছন্দক্রীড়ার মধ্যে একরকম আত্মগোপন ঘ'টে যায়, পরিবর্তে আজ কবি চান ছন্দ-দেহে আপন কণ্ঠস্বরের অনুগামী কোনো স্রোত চালিত ক'রে নিতে, হয়তো গদ্যছন্দে, হয়তো মুক্তছন্দে, আর নইলে প্রচলিত ছন্দ-রূপকেই অল্প একটু বাঁকিয়ে ধ'রে।

আপনার মনে আছে ম্যাক্সমূলর ভবনে সেদিন শক্তি যখন পড়ছিলেন 'আমি স্বেচ্ছাচারী'? কবিতায় বারবার ঐ কথাকটি ঘুরিয়ে আনবার সময়ে ওঁর নানারকম কণ্ঠোৎক্ষেপ, বেশ নাটকীয় ধরনে? কবিতার জন্য এর যে একেবারে দরকার ছিল না তা বলি না। কিন্তু আমি ভাবছিলুম, যিনি ঐ কবিতাটির শ্রোতা নন, পাঠক মাত্র—তাঁর কাছে কেমন ক'রে পৌঁছবে কবির এই ব্যক্তিগত অভিপ্রায়? পুরো যে পৌঁছবে না তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত এই স্বরের প্রয়োগসমস্যাই কবির পক্ষে ছন্দের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, এও ঠিক। ছন্দের এই অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত স্রোত তৈরি হলে তার উপর কবি ভাসিয়ে দেন তাঁর শব্দমালা, তখন পরিচিতি শব্দগুলি একটু একটু ক'রে তার পাপড়ি খুলে নিতে পারে। অভিনয়ের পরিভাষায় ব্রেশ্‌ট যাকে বলতেন 'গেস্‌ট', এই ব্যক্তিগত স্রোত হলো ছন্দের সেই গেস্‌ট —তার ব্যবহারের ফলেই দুই শব্দের মধ্যবর্তী একটা অস্ফুট সম্পর্কের জায়গা তৈরি হয়, কবিতায় শব্দের সমস্যা আর ছন্দের সমস্যা নিতান্তই পরস্পরজড়িত ভাবনা হয়ে ওঠে।

কবিতার ছন্দকে তাই ভাঙতে হয় ছন্দেরই প্রয়োজনে। ভালো লাগাবার জন্যেই ভালো লাগাবার নেশাটা ছুটিয়ে দিতে হয়। সম্পূর্ণকে স্থির লক্ষ্যে রেখে তার পর তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে দেবার মধ্যে একটা সফলতার প্রত্যয় আছে। সেইটেই করতে চেয়েছিলেন সাম্প্রতিকেরা। কিন্তু একেবারে নতুনেরা কী করবেন? তাঁরা তো প্রায় ধরছেনই না, তাহলে ছাড়বেন কেমন ক'রে?

কবিতাপড়া : কথা ও সুর

বড়ো কোনো সভায় নয়, বিনয় মজুমদার একা একা তাঁর কবিতা পড়ছিলেন কফি হাউসের একান্তে, এই অল্প কদিন আগে। ভারি যত্নে আলাদা ক'রে উচ্চারণ করছিলেন এক-একটি শব্দ, একটু জোর দিয়ে, আর হঠাৎ কখনো থেমে থাকছিলেন অনেকক্ষণ। যেন একটা শব্দ তিনি নতুন দেখলেন এখানে, কী ভেবে শব্দটি এখানে বসিয়েছিলেন যেন তাই ভেবে নিলেন একটু। তার পর, যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, আবার শুরু করলেন তাঁর পড়া, তখন যেন গোটা ব্যাপারটার মানে পেয়ে গেছেন তিনি।

ততক্ষণে ধরতে পারলাম যে আসলে আমি তাঁর সামনে কোনো শ্রোতাই নই। বুঝে নিলাম যে এই পড়াটা আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা বোঝাপড়া মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। আর তখন মনে পড়ল যে ওঁর কবিতাও ঠিক তাই, ওঁর কবিতাও তো একেবারেই নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা। বাইরের পাঠকসমাজকে একেবারে অবান্তর ক'রে দিয়ে কবিতা লেখেন বিনয়, এবং সেইজন্যে ওঁর কবিতাপড়ার এই ধরনটাকে মনে হলো রচনার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যময়। এই পড়াটাই যেন ওঁর কবিতার একরকম মানে।

খুব কম কবির গলাতেই অবশ্য কবিতাপড়া কবিতার মানে হয়ে ওঠে। খুব কম সময়েই কবিতা বিষয়ে কবির ধারণা আর কবিকণ্ঠে তার আবৃত্তি একটা অর্থময় সংযোগ পায়। ভালেরি অন্তত অভিযোগ করেছিলেন যে মালার্মের একটানা মৃদু গলার আবৃত্তি তাঁর কবিতা-

তত্ত্বের পরিপন্থী। অর্থাৎ, এমন-কী নিজের কাছেও, কবিতার ইস্‌থেটিক্‌স আর কবিতার আবৃত্তিতে প্রায়ই দেখি একটা বিচ্ছেদ ঘ'টে যায়। কিন্তু কবির একই ব্যক্তিত্ব থেকে যদি জন্মায় এ-দুই ভিন্ন ব্যাপার, তাহ'লে কেমন ক'রে ঘটবে এই বিচ্ছেদ?

আবৃত্তিকে যাঁরা নিতান্ত ব্যসন হিসাবে ব্যবহার করেন, যাঁদের গলা ভালো কিংবা গলাখেলানো ভালো, তাঁদের কাছে এটা কোনো সমস্যা নয়। কেননা তাঁরা কবিতার গদ্য অন্বয়টাকে মাত্র লক্ষ্যে রাখেন, সেইটেকে শ্রোতার কাছে সঞ্চারিত করতে পারলেই তাঁদের সফলতা। কবিতা যে তার চেয়ে বেশি কিছু এটা বুঝে নেওয়া তাঁদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত একটু শক্ত। কিন্তু কখনো-বা সন্দেহ হয় যে জনপ্রিয় এই সব স্থূল আবৃত্তির হাওয়ায় কবিরাও অল্পবিস্তর প্রভাবিত হন। তাঁরা ভুলে যান যে রচনা এবং পাঠের মধ্যে একই অভিজ্ঞতার একই অভিপ্রায়ের সঞ্চার থাকা দরকার। আর এইটে ভুলে গেলেই কবিতাপড়া হয়ে ওঠে একটা শৌখিন ভঙ্গি মাত্র, আসর মজাবার ফিকির।

এটা ঠিক যে আজ অনেকেই জেনে গেছেন, কবিতার শব্দকে একই সঙ্গে তার অর্থ আর ধ্বনির দিক থেকে গণ্য করতে হবে। তাই নামী এবং গুণী আবৃত্তিকারেরা শব্দের দিকে আর কবিতার অন্তঃসারের দিকে মন রেখেই আজ কবিতা পড়তে চান বটে। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যে এই মনোযোগটা বুঝি ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব মাপ। তাঁরা যে বিশেষ ক'রেই শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে চাইছেন শব্দের মহিমা, এই ইচ্ছেটা এতই স্বয়ম্প্রকাশ হয়ে ওঠে যে কবিতাটি শেষ অবধি পৌঁছয় না হয়তো, শ্রোতার কাছে পৌঁছয় কেবল আবৃত্তিকারের একটা নাটুকে আবেগ।

বস্তুত, এই 'নাটক'ই হলো আমাদের কবিতা আবৃত্তির পথে মস্ত এক বাধা। কবিতা পড়ার সঙ্গে নাটক করার স্পষ্ট কোনো ভিন্নতা ধরতে পারেন, এমন আবৃত্তিকার আজকের দিনেও দুর্লভ। প্রায়ই

বরং দেখা যায়, গলা উঠিয়ে-নামিয়ে কাঁপিয়ে-বাঁকিয়ে এমন একটা উত্তেজনা তৈরি হয়, যার আক্রমণে সমস্ত কবিতাটি এক লঘু শিথিলতায় ছড়িয়ে যায়। এমন-কী শম্ভু মিত্র তাঁর এমন আশ্চর্য সুঠাম স্বর নিয়েও কখনো কখনো কবিতা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েন কবিতার বাইরে। এটা মানতেই হয় যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি'তে যে নাটকীয়তা ছিল, অথবা গলাকৌশলের যে প্রশ্রয় ছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতারও সেইটেই স্বভাব নয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতা আবৃত্তি করতে শম্ভুবাবু পছন্দ করেন, সেখানে শব্দাবলি কতটাই স্বরতরঙ্গ সইতে পারে তা ভাবতে হবে, দেখতে হবে কতটা কাঁপিয়ে বলা বা টেনেটুনে বলা সেখানে সংগত। 'চার অধ্যায়ে'র অভিনয়ে 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস' যেভাবে উচ্চারণ করেন তিনি, তা অবশ্যই মানিয়ে যায়, কেননা মঞ্চের দূরত্বে সিলুটের আবছায়ায় আর পুরো ঐ রোম্যান্টিক আবহে অল্প দু-লাইন কবিতা অতীনের প্রেমবৈভবে ও-ভাবেই আসতে পারে, ঠিক। কিন্তু ঐ একই ভঙ্গি আর সংগত লাগে না মঞ্চ থেকে বাইরে এলে, অতীনের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এলে, অর্থাৎ কবিতাপড়ার স্বাভাবিকতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে এলে।

অতিনাটুকে আবেগের প্রয়োগ থেকে সরিয়ে নেবার পরেও কবিতা-পড়ার সমস্যা কাটে না। কবিতা যিনি আবৃত্তিমাত্র করেন না, যিনি অনেকটা ভিতর দিক থেকেই পড়তে চান কবিতা, তাঁকে বুঝে নিতে হয় : কথা বলার স্বাভাবিক ধরনটাই কি তিনি আনবেন গলায়, না কি এর মধ্যে ব্যবহার করবেন কোনো অতিরিক্ত সুর? বলা দরকার যে সুর শব্দটি এখানে ঠিক গানের অর্থে আনছি না। এ হলো এক-রকম প্রকাশ্য আবেগ জাগানো সুর, এ হলো সেই সুর যা হয়তো পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে। নাটক না এনেও শব্দগুলিকে কীভাবে তার ধ্বনি এবং অর্থের মর্যাদায় তুলে নেওয়া যায় স্বরে, তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেখান। অনেকেরই নিশ্চয়

মনে পড়বে, 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় 'একা' শব্দের শূন্যতাময় উচ্চারণ অথবা 'ঝুলন' কবিতায় 'ঝঞ্ঝা' শব্দের ঈষৎ সেই ঝনৎকার। এ-সব ধরা আছে খুবই সূক্ষ্ম স্বরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বহু শব্দের অকারণ অ-কারান্ত ধ্বনিতে অথবা পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মৃদু টানে কিংবা সমস্তটা মিলিয়ে একটা লাবণ্যময় তরঙ্গসৃষ্টিতে যতখানি মন দেন তার থেকেই ধরতে পারি ওঁর কবিতায় সুরের আকাঙ্ক্ষাটুকু। এজরা পাউণ্ড 'গীতাঞ্জলি'র বাঙলা কবিতাই শুনে নিয়েছিলেন কবির মুখে এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন তার সুরপ্রবাহে। তিনি যে আচ্ছন্ন বোধ করেছিলেন তার একটা কারণ হয়তো এই যে পাউণ্ড নিজেও চেয়েছিলেন তাঁর কবিতাপড়ায় একটা সুরই তৈরি করতে, অন্তত তাঁর নিজের আবৃত্তিতে বারেবারেই ধরা পড়ে এই আবেশসঞ্চারী উচ্চারণের অভ্যাস।

এই সুর বিষয়ে আধুনিকের কী মনোভাব? আধুনিক কবি, যিনি নিশ্চয়ই তাঁর রচনাকে বাক্‌স্পন্দের দিকে টেনে নিতে চাইবেন, আবৃত্তিতেও কি তিনি সাধ্যমতো আনবেন না সেই একই স্পন্দ? আর সেক্ষেত্রে সুর কি বাধা হয়ে দাঁড়ায় না স্পন্দের পক্ষে? মধুসূদন কি সেইজন্যেই, বাংলা কবিতার চিরন্তন সুর ভেঙে দেবার জন্যেই, টুকরো টুকরো ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর পড়া? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে মধুসূদন তাঁর কবিতা পড়তেন ভাঙা ভাঙা গলায় প্রতিটি শব্দে থেমে থেমে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তৈরি করতে চেয়েছিল প্রবহমানতা, তার পাঠ কেন হলো এরকম বাধাময়? এ কি স্খলন মাত্র? অনভিপ্রেত একেবারেই? এমন হতেও পারে যে পুরোনো যুগের গীতিময় কবিতার বিরুদ্ধে এ তাঁর এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে বিষ্ণু দে'র আবৃত্তি যে আবেগ বা সুরের বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রতিবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এদিক থেকে দেখলে হয়তো বোঝা যায়, কেন তাঁর কবিতা পড়বার ধরনটা একটা বিশেষ ছাঁদে বাঁধা। ছন্দের মধ্যে রেখেই কবিতায় যে গদ্যটান তিনি তৈরি করতে চান, তাঁর অনেকটা অনাসক্ত

নৈর্ব্যক্তিক গলায় সেটা ধরা পড়ে ভালো। বুদ্ধদেব বসুর সুরেলা কবিতাপাঠের সঙ্গে বিষ্ণু দে'র এই ছেড়ে-ছেড়ে-দেওয়া কবিতাপড়ার ধরন তুলনা ক'রে দেখলে মনে হয় যে দুজনেরই কবিতাবোধের সঙ্গে, সংগত তাঁদের কবিতাপড়ার গলা।

সুরের প্রয়োগ বিষয়ে আধুনিকেরা যে সকলেই একরকম ভাবেন না, এখানে বুদ্ধদেব বসুর নাম থেকে সেটা অনুমান করা যায়। অবশ্য বুদ্ধদেবের গলা গড়িয়ে আসে একান্ত লালিত্যে, সুর আর বাচনের কোনো সামঞ্জস্যের কথা যে তিনি ভাবছেন এমন নয়। ভালেরি— যিনি মনে করেছিলেন ছাপা কবিতাও ছাপা গানের মতোই অসম্পূর্ণ, দুটোই প্রতীক্ষা করছে কোনো স্বরলিপির—সেই ভালেরি গানকেই ভেবেছিলেন আবৃত্তির উৎস। গানে শব্দ তার অর্থ হারিয়ে একেবারে স'রে যায় ধ্বনির দিকে, প্রাত্যহিক বাচনে শব্দ তার ধ্বনি হারিয়ে একেবারেই স'রে আসে অর্থের দিকে। আবৃত্তিতে ভালেরি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন এ-দুইয়ের কোনো মধ্যপথ। জানি না ঠিক সেরকম পথ কতটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নিজের গলায়, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আবৃত্তিতে সুরভঙ্গিমার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত, তাঁরও নেই কোনো সামঞ্জস্যের দিকে ঝোঁক।

বাক্‌স্পন্দের প্রতি একেবারে অনুগত থেকেও, স্বরে অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিকতা রেখেও কীভাবে সংযমিত সুর এবং নাটককে ধরা যায় গলায়, তার সুন্দর উদাহরণ পাই এলিয়টের প্রগাঢ় কবিতাপাঠে। যাঁরা শুনেছেন এলিয়টের 'দি হলো মেন' বা 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর আবৃত্তি, তাঁরা মনে করতে পারবেন, কীভাবে তিনি অল্প ক'রে দুলিয়ে দেন 'Here we go round the prickly pear' অথবা 'London bridge is falling down', ধরিয়ে দেন এর জন-জীবনগত উৎস; কেমন চকিত নাটকে তিনি উচ্চারণ করেন 'Not with a bang but a whimper'-এর whimper শব্দটি; অথবা কেমনভাবে তাঁর কবিতার অন্তর্গত চরিত্রগুলিতে পৌঁছে দ্রুত পরম্পরায়

এদের স্বরস্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেন হালকা নাট্‌কেপনা না ক'রেও। এলিয়টের এই কবিতাপড়া থেকে আমাদের কিছু শিখবার আছে মনে হয়। কবিতা যেমন বাচনমাত্র নয়, বাচন আর গূঢ়তর সুরের বুনুনিতেই যেমন কবিতা—তেমনি কবিতাপড়ার মধ্যেও চাই প্রচ্ছন্ন এক সুর এবং নাটক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন কোথাও এই সুর বা নাটক আলগা হয়ে মাথা না তোলে, শ্রোতাদের যেন এম্‌নি মনে হতে থাকে যে গোটা ব্যাপারটাই প্রতিদিনের কথাবার্তার সন্নিহিত। যেমন কবিতায়, তেমনি কবিতাপড়ায়, এ-দুটিকে মিলিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত কথা—কিন্তু এই মিলিয়ে নেওয়াই হলো সত্যিকারের পথ।

কবি আর তাঁর পাঠক

একাত্মবোধ

'কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে'; এ কথা বলতে হলো জীবনানন্দকেই, নির্জনতম নামে যাঁর পরিচয়। আসলে কবির নির্জনতা—অথবা কেউ যদি তাকে বলেন আত্মরতি—সেও এক ছল মাত্র। এরই মধ্যে গোপন থেকে পৃথিবীর সারাৎসার আত্মগত ক'রে নেবার আয়োজন করেন তিনি। আয়োজন করেন কবিতার পাঠককেই কবিতার বিষয় ক'রে নেবার।

কিন্তু সাম্প্রতিক পাঠক বলছেন যে আজ আর তিনি বিষয় নন কবিতার, তাই কবিতা থেকে ফিরে আসে তাঁর মন। আধুনিক রচনা কেন অবোধ্য, তা বিশ্লেষণ ক'রে অনেকেই দেখতে চান বটে এর শব্দের বা প্রতিমার বাঁকানো ভঙ্গি, এর ছন্দের আপাতপঙ্গুতা, এমনকী এর বাক্‌বিন্যাস বা স্বরক্ষেপের বিপর্যস্ত নতুন ধরন। একথা বলার মানে নেই যে বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটাও পশ্চিমি পুঁথি থেকে পাওয়া, কেননা স্পন্দবদলের এই সত্য আমরা জীবনে হামেশাই টের পাচ্ছি। গ্রামের ছেলে কলকাতায় এলে হঠাৎ সে বুঝতে পারে না সমবয়সী যুবার বুলি, আর কলকাতার মানুষই আজ পরস্পরকে আর ধরতে পারছে কম। পালটে গেছে শব্দ অথবা শব্দ-সাজাবার-প্রণালী। কিন্তু এই অসুবিধে যিনি অতিক্রম ক'রেও যান তিনিও শেষ অবধি ফিরে আসেন কাতর বোধে, কেননা তিনি হতাশ হয়ে দেখেন: আজ আর তিনি কবিতার বিষয় নন।

তখন প্রশ্ন করি, কীভাবে পাঠক নিজেকে দেখতে চান কবিতার

ভিতরে। শিল্প-অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রায়ই এসে যায় দর্পণের উপমা, কিন্তু সে-দর্পণ তো চণ্ডালিকা প্রকৃতির হাতে-ধরা আয়না, আপনমুখ অতিক্রম ক'রে সেখানে দেখা দিতে থাকে মথিত এক বাসনাবিশ্ব। বস্তুত মনে রাখা চাই যে ভালোবাসার মতো কবিতাও নিজেকে নিজের থেকে বার ক'রে আনবার উপায়, পাঠক হিসেবে আমাদের সেই নিঃসৃত সত্তাই আমরা খুঁজে নিতে পারি কবিতায়। এই সত্তাকে যদি পাঠক না দেখতে পান রচনার মধ্যে তাহলে কি সেটা কবিতারই গৌণতা নয়, কবিতারই অপরাধ নয়?

কিন্তু এইখানে, অভিযুক্ত করবার আগে, আরেকটি কথা ভাববার আছে। রচয়িতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় যুগগত আকাঙ্ক্ষার পরিমাণসীমা। ইয়ুং যে যৌথ নির্জ্ঞানের কথা বলেন, তাই পরিচ্ছিন্ন রূপে ভেসে উঠতে থাকে স্পর্শচেতন মনে। এই নির্জ্ঞান কি আজ তেমন প্রস্তুত? আমাদের সমগ্র জাতীয় মানসের অভ্যাস কি তেমন সংগত কবিতাসৃষ্টির অভিমুখী? হয়তো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কবিতাই পাঠকের হাতে ধ'রে নিয়ে যায় আলোর দিকে, তবু পাঠককে তো প্রসারিত ক'রে দিতে হয় সেই হাত! এই সম্প্রসারণের, অর্থাৎ নিজেকে নিজের বাইরে আনবার কোনো অবসর কি আমাদের ভিতর কোথাও প্রস্তুত আছে? আমরা কি কোনো একটি বিন্দুতে নিজেকে অভিক্ষেপণ করবার, নিজেকে মিলিয়ে নেবার দীক্ষা দেখছি? আমার দেশের সঙ্গে? আমার ভাষার সঙ্গে? আপন আপন ছোটো বৃত্তে মানবিক কোনো দায়িত্বের সঙ্গে? কথাটা কর্তব্যবুদ্ধির নয়, একাত্ম-বোধের। যতক্ষণ পর্যন্ত না তেমন কোনো বোধের সামান্যসীমা প্রস্তুত হবে, ততক্ষণ কবিতার মধ্যে কবি তাঁর যে-অস্তিত্ব দেবেন এবং পাঠক সেখানে তাঁর যে-অস্তিত্বকে খুঁজবেন তার কোনোটাই তাঁদের সত্য শরীর নয়। তাই এ-সব নিয়ে কবিতার ভাবনাও নয়। কী ভাবে তার বাইরে এসে একাত্মতার কোনো ভূমি রচনা করা যায়, আমাদের ভাবনা কেবল এই।

অভিজ্ঞতার জগতে তাই এমন একটা জায়গা চাই যেখানে সহজে মিলতে পারেন কবি আর তাঁর পাঠক। সেই যোগটুকুকে সূত্রের মতো ব্যবহারমাত্র ক'রে পাঠককে কবি নিয়ে আসতে পারেন তাঁর আপন জগতের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু কোথায় তেমন মিলনভূমি?

তারই খোঁজে কখনো-বা আমাদের ফিরে তাকাতে হয় দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে। নিজের থেকে মুক্তি নিয়ে বাইরে বেরুবার মস্ত এক উপায় আছে এইখানে। কিন্তু বিপদ এই যে প্রায়ই একে আমরা এক ক'রে ফেলি অতীতের সঙ্গে এবং অন্ধ প্রথানুসরণকে দেশপ্রেম ভেবে মুগ্ধ থাকি। দেশীয় চলনের বহিরবয়ব হলো প্রথা মাত্র, তার নির্যাসে আছে ঐতিহ্যের পরিচয়। সে-নির্যাস আছে ভাষার ভিতরকার চালে, ছন্দস্পন্দে, আমাদের ভাবনাচেতনার শুদ্ধ প্রকৃতিতে। নিয়মের বন্ধনমুক্ত ক'রে এইভাবে তাকে দেখা যায় ব'লেই এজরা পাউণ্ড একদিন বলতে পেরেছিলেন, ঐতিহ্যই হলো সৌন্দর্য।

আমাদের চেতনায় কি ছড়ানো আছে তেমন কোনো অন্তঃস্যূত ঐতিহ্যের দায়? বহির্বিশ্বে যদিও আমাদের পরিচয় ঐতিহ্যবাদী হিসাবে, কিন্তু সে কেবল এ-শব্দের অধ্রুব অর্থে। সত্যি বলতে, চল্‌তি জীবনধারায় অতীতকে নিত্যই পুনর্বিন্যস্ত ক'রে নেবার কোনো সতেজ অভিজ্ঞতা আজ আমাদের অল্পই ঘটে।

'গীতাঞ্জলি' পড়বার মুগ্ধতায় ইয়েট্‌স এক অবিচ্ছিন্ন বাঙালি সংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন, যার সবটা জুড়ে পাওয়া যাবে এক সর্ব-সদৃশ মানসিক গড়ন। তাহলে সেই সমাজে না কি একদিন পথের ভিখিরি পর্যন্ত বুঝে নিতে পারবে সুরে-শব্দে মেলানো এই গানগুলির গূঢ় আবেদন। সে-তুলনায়, আক্ষেপ করছেন ইয়েট্‌স, কতই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাঁর নিজের দেশ!

কিন্তু ইয়েট্‌সের ঐ স্বপ্ন সত্যি ছিল না তখনকার বাঙলাদেশে, আর আজ পঞ্চাশ বছর পরে সামাজিক ভাঙনের চেহারা তো আরো সম্পূর্ণ। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে এই ভঙ্গিলতার একটা সম্পর্ক হয়তো আছে, কিন্তু ওরই সঙ্গে আমাদের মৌলিক সংকটটি মনে রাখেন নি প্রতীচ্য এই কবি, মনে রাখেন নি যে আমাদের এ এক বিদেশি-লালন-পুষ্ট আত্মপরিচয়হীন বহুধাছিন্ন সমাজ! এ-সমাজে একদিকে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ করতে হয় এই ব'লে যে, কনারক বা অজন্তা রয়ে গেছে কনারক বা অজন্তারই কালে, তাকে সচল ক'রে নেবার কোনো সাধনা হয় নি আমাদের জীবনে বা শিল্পে; অন্যদিকে বুঝতে হয় যে পাশা-পাশি বসতি ক'রেও নিজেদের মধ্যে আমরা বহন ক'রে চলছি বহু ভিন্ন সংস্কৃতির ভাঙা টুকরো, তার মধ্যে সংগত কোনো সামঞ্জস্য নেই। আর, এটা যে কেবল আমাদের সাম্প্রতিক সময়ের বিলাপ তাও নয়। যে বিগত শতাব্দীকে রেনেশাঁস ভেবে আত্মপ্রসাদ বোধ করি, সেখানেই ছিল সর্বনাশের সূচনা।

দেশের মধ্যে দেশহীনতার এই ভয়ংকর পরিমণ্ডলে কবিতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। জাভায় ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ছিলেন সে-দেশের আত্মস্থ শিল্পসুষমার ধরন দেখে। অল্পপরিসর এই দ্বীপে কেমন ক'রে সম্ভব হলো এটা? রবীন্দ্রনাথের উত্তর: 'এদের মধ্যে আছে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়।'

আমাদের দেশ অল্পপরিসর নয় এবং আমাদের নেই কোনো সমজাতীয় মনোবৃত্তি। তবু, বিধ্বস্ত এই মানসিকতার গহনে এখনো হয়তো আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের কিছু অনুষঙ্গ লুকোনো আছে কোথাও। তাকে প্রবাহিত ক'রে নেওয়াই, কবি এবং কবিতার পাঠককে সেই ঐতিহ্যের মধ্যে সচল ক'রে দেওয়াই আজ কবিতার কাজ। নির্জন আত্মস্থতা এই দায়িত্ব বহনেরই একটা গোপন আয়োজন মাত্র।

তার মানে এ নয় যে প্রতি রচনায় কবি নতুন ক'রে একবার সচেতন হয়ে ওঠেন তাঁর ঐতিহ্য বিষয়ে। দেশীয় পুরাণ অথবা দেশীয় প্রকৃতির একটা শুদ্ধ অনুষঙ্গ যে সর্বত্রই ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তেমন কোনো যান্ত্রিক অভ্যাসে বরং বিপন্নই হয় কবিতার জগৎ। ঐতিহ্য যেমন নির্যাসরূপ, তেমনি কবির অস্তিত্বে সে বহমান থাকে কেবল প্রচ্ছন্ন চরিত্রে, তাঁর মজ্জার মধ্যে। তখন তাঁর ছন্দে শব্দে প্রতিমায়, কবিতার সামগ্রিক স্বভাবেই এমন একটা টান তৈরি হয় যা কখনোই আমাদের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রচ্যুত হতে দেয় না কবি তাঁর পাঠকের সঙ্গে মিলনভূমি পেয়ে যান সেইখানে।

কিন্তু এই মিলনের একটা সহজ ভিত্তি কি নয় সমসময়?

তখন প্রশ্ন ওঠে, কাকে বলি সমসময়। আমরা সকলে যে ঠিক একটাই সময়ে বেঁচে আছি, আমাদের সকলের সময় যে একেবারে সমান একথা তত সত্যি নয়। শিক্ষিত মানুষ আর অশিক্ষিত মানুষ, গ্রামীণ মানুষ আর নাগরিক মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ আর মসীজীবী মানুষ—একই মুহূর্তে বেঁচেও কি এরা সবাই একই সময়ের বাসিন্দা? সময়ের যেন ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি তল তৈরি হয়ে আছে আমাদের ভিন্ন জনের অভিজ্ঞতায়, এরা যে সহজে পরস্পর মিলে যাবে এমন আশা কম। যদি-বা সেই সর্বসমতা ঘটত কখনো, দেখা দিত এক দ্বিতীয় বিপ্লব। সমসময় কি একটা প্রচ্ছদ মাত্র নয়? মানুষের জীবনকে ধ'রে রাখবার সে তো এক বহির্বাহক মাত্র। আমাদের প্রত্যাশাকে আমাদের প্রত্যয় অথবা পরিণামকে একেবারে ভিতর দিক থেকে খুলে দেখায় না সে। তার ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়েও আধুনিক লেখক তাই এইখানেই থেমে যেতে পারেন না।

সেইজন্যই কি ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া?

ঐতিহ্য অতীতমাত্র নয়, তাই স্থাণু নয় তার স্বভাব। তবু এক হিসেবে সেও বন্দী। নদীর মতো, দুধারে সীমা দিয়ে বাঁধা তার প্রবহমানতা। এর মধ্যে যে-সময়কে আমরা পাই সে এক দেশনিহিত সময়। তার দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ালে এক ভুল দেশপ্রেমের জন্ম হয়, ছোটো এক জাতীয়তার ক্ষীণ চক্রে আবর্তিত হবার ভয় দেখা দেয়। কখনো যে এমন ঘটে নি তা নয়, শিল্পচর্চার এক-একটা আন্দোলনে প্রাচ্যদেশীয়তার এমনি অতিচার একদিন দেখা গিয়েছিল, কবিতাও কখনো-বা বড়ো বেশি ভালোবেসেছিল পুরাণপ্রকৃতির জড়তাময় অনুসরণ।

এটা অবশ্য ঠিক যে অবনীন্দ্রনাথও তাঁর অনুরাগীদের পরে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন : 'নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, ঐ অজন্তার মুখেই চলো আর গ্রীস জাপান চীনের দিকেই চলো সে পরের রাস্তা ধ'রে চলা ছাড়া আর কিছু হবে না'। মুক্তি তবে কোথায়? 'অজন্তা গুহায় সেটা পাইনি, ইওরোপে এশিয়াতে সেটা লুকোনো ছিল না, ছিল সেটা লুকোনো আমার নিজের বুকের মধ্যেকার একটা কৌটোতে' : এই ছিল তাঁর উত্তর। কিন্তু এইখানেই আমাদের প্রতীক্ষা ভেঙে যায়, এ-উত্তরটা আর আধুনিকের তত কাজে লাগে না। না, অস্পষ্ট এই আত্ম-আদর্শে নয়, আধুনিক শিল্পীর কাজ এই যে তিনি তাঁর দেশনিহিত সময়কে স্পষ্টভাবে এনে দাঁড় করিয়ে দেন দেশোত্তর সময়ের মুখোমুখি। নদী এসে মিলে যায় সমুদ্রে। কেবল ঐতিহ্য নয়, তখন তিনি চান প্রবহমান বিশ্বকালকে তাঁর মধ্যে বহন করতে, আর এ-দুইয়ের নিরন্তর সংঘর্ষ থেকে দেখা দিতে থাকে আজকের দিনের আধুনিকতা।

এইটেই মনে ছিল, যখন জীবনানন্দ বলেছিলেন, কবিতার অস্থি-র মধ্যে চাই ইতিহাসচেতনা আর তার মর্মে চাই পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। এই জ্ঞানেই উজ্জয়িনীর সময় মিশে যায় মিশর বা গ্রীসের সঙ্গে, এই চেতনাতেই এক নিশ্বাসে বাঁধা পড়ে উর্বশী আর আর্টেমিস। কিন্তু

কবি কখনোই ভুলে যান না যে এক হাতে এই দেশনিহিত কাল আর অন্য হাতে দেশোত্তর কাল ধারণ করবার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের ওপর। সময়ের এই জটিল প্রত্যাঘাতই কবিতাকে এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে সঞ্চারিত ক'রে নেয়।

অমরতা

এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্ত ? এ কি তবে অমরতার অভিমান ?

যিনি লেখেন তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভাবতেই হয়, কার জন্য লিখি। যেমন, যিনি বলেন তাঁকেও বুঝে নিতে হয়, কার জন্য বলি। বুঝে নেবার চেষ্টা তাঁরা করেন, কিন্তু সব সময়ে যে তৃপ্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন তা হয়তো বলা যায় না। অবশেষে তাঁদের নির্বাচন ক'রে নিতে হয় শ্রোতৃসমাজের ছোটো একটা অংশ। যেমন লিখেছিলেন সার্ত্‌ : 'আমাদের সামনে ছোটো এক পাঠকবৃত্ত প'ড়ে আছে বেলাভূমির মতো রৌদ্রময়, আর বৃহৎ পাঠকসমাজ ছড়িয়ে আছে দূরের নীলিমায়, অজানা সমুদ্রের মতো'। ছড়ানো এই সমুদ্রের প্রতি আপাতত বিমুখ থাকাকেই অভিমানী লেখক বুঝি সংগত ব'লে ভাবেন।

কিন্তু 'আপাতত' কেন ? তবে কি তিনি এই বিমুখতাকে স্থায়ী ভাবেন না ? তাঁর আত্মবিশ্বাস কি এতটাই যে তিনি ভাবেন, আপাতত-উপেক্ষিত সমাজ ক্রমে একদিন দীক্ষিত হয়ে উঠবে তাঁর রচনার অভিমুখে ? শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিমার্জনার সঙ্গে সঙ্গে সে-সমাজেরও রুচি বা অভিপ্রায় পালটাবে একদিন ? এই বিশ্বাসে সমকালীন জন-নন্দন বর্জনীয় ভেবে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন দূরবর্তী অলীক এক অমরতার প্রতি। যেমন সমগ্র দেশকে শোনাবার ইচ্ছে থেকেও অগত্যা তিনি নির্বাচন ক'রে নেন ছোটো একটা শ্রেণী, তেমনি

সমগ্র কালকে লক্ষ্যে রেখেও শক্তি বা অভ্যাস মতো তাঁকে বিশেষ-ভাবে গণ্য করতে হয় টুকরো একটা সময়।

কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে যাওয়া এই শূন্যবিহারী দিনে অমরতাকে কে আর তেমন ভরযোগ্য ভাবেন! রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপরের পাঠককল্পনা অথবা র‍্যাঁবো যে ভেবেছিলেন ভাবীকালের মেয়েরা একদিন সবাই হবে কবি, তাকে বলা যায় এক অলস মুহূর্তের ভাবনা-বিলাস। একে উপহাস ক'রে এক যুদ্ধের শেষে নজরুল আমাদের শুনিয়েছিলেন 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী,' আরেক যুদ্ধে শোনা গেল সুকান্তের উচ্চারণে 'ইতিহাস, নেই অমরত্বের লোভ / আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ'।

দার্শনিক মহাসময়ের পটে বসিয়ে দেখলে কবিতার চিরন্তনতার কোনোই মানে নেই নিশ্চয়। কয়েক কোটি বৎসরের অবসানে জ্যোতির্মণ্ডল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে সূর্য, এই বৈজ্ঞানিক খবরেও আমাদের তত ভয় হয় না, বরং মনে পড়ে 'কণিকা'র কৌতুকবাক্য: 'পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া / তোমার কতটা আয়ু এসো শুধাইয়া'। তাহলে কাকে বলি অমরতা? বস্তুত এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে স'রে যাওয়ার ইচ্ছে, এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে পৌঁছে দেবার ইচ্ছে—এরই কি অন্য নাম নয় অমরতা? সে-হিসেবে দেখলে রচনামাত্রেই অমরতাপ্রত্যাশী, এমন-কী মৌখিক উচ্চারণমাত্রেই অমরতার আকাঙ্ক্ষাময়। কথার আয়তনের ওপর নির্ভর করে কত দূরে পৌঁছবে সেই কথা, কত দিন বাঁচবে তার মর্যাদা। কিন্তু নজরুল বা সুকান্তের কবিতাও কি কেবল তাঁদের নিজের দিনের মধ্যে নিঃশেষ হবার ইচ্ছেয় রচিত ছিল। একেবারে প্রত্যহে? গতকালের খবরের কাগজের মতো অব্যবহার্য হয়ে যাক কবিতা, এতটাই প্রাত্যহিক ক'রে কবি গড়তে চান না তাঁর রচনা। হয়তো শতাব্দপারের ভাবনা নেই মনে, তবু কি কবি ছেড়ে দেন আগামী কালের ভাবনা? একেবারে কি প্রত্যহেই ধ্বস্ত হতে চাই আমরা? তাঁর মৃত্যুলিপিতে লিখেছিলেন

মায়াকভ্স্কি: 'প্রত্যহের শিলাস্তূপে লেগে খানখান হয়ে যায় ভালোবাসার নৌকো'। প্রত্যহের সঙ্গে ভালোবাসার এই সংঘর্ষ, এই বেদনাবোধ থেকেই তো জন্ম নেয় কবিতা।

তাই, অমরতার ইচ্ছে সত্যি সত্যি ফুরোয় না। এক মানুষ যে আরেক মানবীকে তার ভালোবাসা জানায় সেও এই অমরতারই আকাঙ্ক্ষা, এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে, এক মুহূর্তের থেকে আরেক মুহূর্তে স'রে যাবার অমরতা। আমাদের বোধের মধ্যে যতটুকু সময় আমরা ধারণ করতে পারি তার দিক থেকে দেখলে, যদিও মানুষের মৃত্যু হয়, মানব থেকে যায়। নির্জীব কথারও তেমনি প্রতিদিন মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু কবিতা তবু থেকে যায় আর কটা দিন। কথার সেই অন্তঃসার, সেই কবিতার খোঁজে সময় কাটে কবির।

রাজনীতি

অথচ রাজ্য ভাঙাগড়ার এক-একটা উত্তেজক মুহূর্ত আসে যখন উলটো একটা অভিমান জেগে ওঠে পাঠকের মনে: 'শিল্পের এখন কী কাজ? কতটুকু সে করতে পারে আমার?' প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অসহযোগ আন্দোলনের বিভ্রমে এরকম ভাবেই এক মহিলা ধিক্কার জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, বলেছিলেন: 'দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন প্রমথ চৌধুরীকে: 'দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে সময় খারাপ, অতএব বাঁশি রাখো লাঠি ধরো।... বুঝতে পেরেছি এই নিয়ে ঘরেপরে আমাকে ত্যাগ করবে।'

প্লেটো যে একদিন কবিকুলকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন, তার একটা কারণ এই। তাঁর মনে হয়েছিল, সৌন্দর্যের মোহে মানুষ সত্যের চেয়ে অনেক দূরে স'রে যায়, আবেগমায়াকে বেশি প্রশ্রয় দিলে ক্রমে সে হয়ে পড়ে দুর্বল। স্পার্টার হাতে অ্যাথেন্সের যে

পরাভব ঘটেছিল তার একটা কারণই নাকি অ্যাথেন্সের নিবিড় শিল্প-ভাবুকতা। গীতগোবিন্দের বাঙলাদেশ থেকে খিড়কির পথে একদিন পালাতে হয়েছিল লক্ষ্মণ সেনকে।

শিল্প বিষয়ে এই হলো একটা প্রান্তিক ধারণা। আবার এর উলটো দেখতে পাই তখন, যখন কেউ ব'লে বসেন: 'রাষ্ট্রসংকট? কিন্তু এ নিয়ে শিল্পীর কী বলার আছে?' এইরকমই ব'লে উঠেছিলেন অডেন, অল্পদিন আগে যখন ভিয়েৎনাম বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো। এ প্রসঙ্গে লেখকদের কেন বলতে হবে কিছু, তা তিনি বুঝতে পারেন নি, আর বললে যে তাঁরা খানিকটা বোকার মতোই বলবেন এও তাঁর ধারণা হয়েছিল। তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর যৌবনে, ১৯৩৭ সালে, স্পেনের গৃহসংকটের সময়ে অনুরূপ প্রশ্নমালা তাঁরাই তৈরি ক'রে পাঠিয়েছিলেন লেখকদের কাছে, সেখানে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে উঁচু মিনারে নির্লিপ্ত ব'সে থাকার সময় আর নেই আজ। লেখকদেরই উত্তর চাওয়া হয়েছিল, কেননা তাঁরা হলেন, তরুণ অডেনদের ভাষায়: the most sensitive instruments of a nation!

তাই সংকটমুহূর্তে সুবেদী কবিদল যে আর্তনাদ ক'রে উঠবেন, এ তো তাঁদের চরিত্রেরই পক্ষে সংগত। কর্তব্যবোধে নয়, পরিপার্শ্ব বিষয়ে তাঁরা আতুর হয়ে ওঠেন স্বভাববশেই। রবীন্দ্রনাথকেও সে-কথাই বলতে হয়েছে বারংবার। সেই মহিলাটি যখন ধিক্‌কার জানাচ্ছিলেন তাঁকে, বর্ষামঙ্গলের বাঁশি-বাজানো রবীন্দ্রনাথ তখনই তাঁর সমসাময়িক বহুতর দুর্ভাবনা বেঁধে রাখছিলেন অ্যাণ্ড্রুজের কাছে চিঠিপত্রে কিংবা 'কালান্তরে'র প্রবন্ধমালায়। কিন্তু ওরই সঙ্গে, প্রায় একই দিনে, বলতে হয় তাঁকে: 'তাই আজকাল নতুন ছন্দ তৈরির খেলায় মেতেছি'। এই 'তাই' শব্দটি কি তাহলে পালিয়ে যাবার ছল হিসেবে গণ্য হবে? বাইরের চঞ্চলতার সঙ্গে ভিতরের ছন্দনির্মাণের এই কার্যকারণ সম্পর্কটা সাধারণ বোধের অগম্য বটে, কিন্তু একই

সঙ্গে চলতে থাকে শিল্পীর এই দুই দায়িত্ব। কখনো কখনো দুটি হয়তো বেঁকে যায় আপাতবিরোধে, একেবারে দুই বিপরীত পথে।

আবার কখনো এ-দুটি এসে এক বিন্দুতে মিলেও যায়। যায় ব'লেই জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন' অথবা 'রূপসী বাংলা'র কবি হিসেবে যাঁর আধখানা পরিচয় আজ জনপ্রিয়, তাঁকে উচ্চারণ করতে হয় চল্লিশের দুঃখময় দিনগুলিতে পৌঁছে :

> মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
> ভ'রে গেছে : পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
> ভাই আমি ;······
> যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
> ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
> হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
> আর তুমি ?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
> চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
> ব'লে যাবে 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার ;
> মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'

চঞ্চল সমসাময়িক তখন কলরব ক'রে ওঠে ছন্দেরই মধ্যে। হত মানুষ আর হন্তারক মানুষ দুয়েরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান কবি। পাঠকের সঙ্গে তখনই তিনি মিলে যান তাঁর দুঃখে, তাঁর পাপে।

কবিতার তুমি

'পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ডগ' বইটিতে কৌতুকজনক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ডিলান টমাস। এক দুষ্টু ধরনের আত্মীয় ছিলেন, ছোটোবেলায় পাড়ার মেয়েদের খেপিয়ে বেড়ানোই ছিল যাঁর কাজ। বাড়িতে ব'সে পদ্য লিখতেন তাদের নামে, পাঠিয়ে দিতেন তাদের জানালায় জানালায়। অনেকদিন পরে ইনি হলেন এক পাদরি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যখন পরিহাস করা হলো : 'সে-সব পদ্য কি পুড়িয়ে ফেলেছ এখন?' নবীন পাদরি অবাক। কেন, পোড়াতে হবে কেন? সে-সব কবিতা এখন তিনি ঈশ্বরের নামে ব্যবহার করেন।

ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তর হেসেছেন টমাস। প্রেমিকার নামে লেখা কবিতাগুলি কেমন ক'রে চ'লে যায় ঈশ্বরের উদ্দেশে, এই হলো হাসির বিষয়। বিশেষ ওই কবিতাগুলি যেহেতু আমরা কেউই পড়িনি, সেজন্য এ ঘটনার হাস্যজনকতা কতদূর বিস্তৃত তার পুরো বিচারও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো-বা পুরোপুরি পরিহাসেরও নয়, আমরা তো আমাদের দেশীয় অভিজ্ঞতায় জানি যে কবিতার সৃজনকালীন উদ্দেশ্যকে সরিয়ে দিয়ে অনেক সময়েই তাকে আমরা প'ড়ে থাকি নবীন তাৎপর্যে। বৈষ্ণব কবিরা ঈশ্বরকেই ধ্যান করেছিলেন না কি তাঁদের আপন ঘরের প্রেয়সীকে, এ নিয়ে সংশয় জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন 'গীতবিতানে' প্রেম আর পূজার শ্রেণী করেন, সে-বিষয়ে সব সময়ে দ্বিধাহীন হ'তে

পারি না আমরা। 'তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে' কি প্রেমেরই গান অথবা পূজার, 'আমারে করো তোমার বীণা' যদি প্রেমিকের কথা 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' তবে কেমন ক'রে পূজার্থীর বেদনা, 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে' 'রক্তকরবী'তে বিশুর এই গানটি কেমন ক'রে পৌঁছল 'গীতবিতানে'র প্রেমের পর্যায়ে —এ-সব আমরা ঠিক ক'রে উঠতে পারি না।

বস্তুত ইচ্ছা এবং রুচি মতো পর্যায়ের কিছু অদলবদল অনায়াসেই ঘটতে পারে। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই প্রাকৃতিক গানটিতে যখন শুনি 'তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা' তখন সেই 'তুমি' কারো কাছে দয়িত, কেউ বা ভাবেন পরমতা। এমন-কী একই জন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকম ভাবতে পারেন, এতটাই সম্ভব।

সম্ভব, কেননা 'তুমি' সর্বনাম। এই 'তুমি' কার উদ্দেশে প্রযুক্ত হচ্ছে কবিতায়, অনেক সময়েই তা অস্পষ্ট থেকে যায়। হয়তো কখনো কখনো এই অস্পষ্টতা কবিতার সৌন্দর্যই বাড়ায়, তার মধ্যে এনে দেয় বহুমাত্রিক সম্ভাবনা। কেবল তুমি-আমি'র প্রয়োগেই যে বহুবিচ্ছুরণের এই সংগতি থেকে যায় তা নয়, কখনো কখনো তো দেখি নারী তরুণী বা যুবতী শব্দের উল্লেখেও নিশ্চিত বোধ করেন না পাঠক, তিনি বুঝতে পারেন না যে এই নারী নিতান্তই কোনো লৌকিক অভিজ্ঞতা কি না, কবিতাটি অবধারিত রূপে কোনো প্রেমেরই কবিতা কি না। 'দিনশেষ হয়ে এলো আঁধারিল ধরণী': 'চিত্রা'র অতিসুকুমার সেই কবিতাটি মনে করুন। আমি যদিও ভাবতে পারি না যে একজন অনুরাগীর কলমে আঁকা স্নিগ্ধ এক স্থানিক চিত্রের চেয়ে বেশি কিছু ওতে আছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক এক মান্য সমালোচক একে গণ্য করেন জীবন-দেবতার কবিতা হিসেবে। ভরাঘট ছলছল ক'রে নতমুখে যে তরুণীটি চ'লে গেলেন, যাঁকে দেখে কবির ইচ্ছে হলো 'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী', তিনি না কি অভ্রান্তরূপেই জীবনদেবতার প্রতিমা।

কবিতাপাঠের এ-পদ্ধতিকে পরিহাস করাই আপাতত আমার

উদ্দেশ্য নয়। বরং বলতে চাই যে পাঠককে সতর্কই থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে 'তুমি' কোনো নিকটনারী বা প্রেমিকাকে বোঝালেও এর সর্বনাম-সুযোগ অনেক সময়েই চ'লে যায় তাকে অতিক্রম ক'রে। এই তুমি কোথাও-বা ঈশ্বর, জীবনবিধাতা, কোথাও বন্ধু বা জনসমাজ, অথবা আরো কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা নিরুপাধিক সত্তা; কিন্তু অনেক সময়েই যে এই তুমি বস্তুত কবির আমিরই আরেকটা নাম, এইটে লক্ষ না করলে আমরা হয়তো গর্হিত ভুল করব। এই অর্থে কবিতার আমি-তুমি'র সম্পর্কশাসন অনেক ক্ষেত্রেই কবির অন্তর্নাটকের খেলা হয়ে ওঠে, নিজেরই সঙ্গে নিজের প্রীতি বা লড়াইয়ের এক ছবি।

আসন্ন সন্ধ্যায় বন্ধুজনকে অথবা প্রেয়সীকে আমরা অনেকেই হয়তো আধা পরিহাসে শুনিয়েছি এলিয়টের সেই অত্যুক্ত লাইন: Let us go then you and I! লাইনটি ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে পুরো কবিতা থেকে, এবং যদি পুরো কবিতাটি সেই মুহূর্তে লক্ষ্যে নেবার কোনো দায় না-ই থাকে তবে কেনই-বা প্রেমোচ্চারণ হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যাবে না? কিন্তু অল্প পরেই আমরা ধরতে পারি এই তুমি অন্য কেউ, প্রুফ্রক নিজেই তো চলেছেন প্রেম নিবেদনের অভিপ্রায়ে, অন্যত্র; তাহলে সঙ্গে এই কাকে তিনি নিতে চাইছেন আসন্ন সন্ধ্যাবেলা? কে তাঁর তুমি?

এখানেই তুলতে হবে অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যা। আমাদের অস্তিত্ব এমনিতেই ভিতর থেকে নানাখানা হয়ে আছে এবং তার একটা দিক বাইরে মুখ-ফেরানো, অন্য দিক ধরা আছে কেন্দ্রে। এ-দুইয়ের মধ্যে সর্বায়ত সংগতি যতই ছিন্ন হতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে ততই বেদনারক্তিম, ততই টান-টান চেতনা ধরা পড়তে থাকে এই দুই বিপরীতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এরই একটা দিক কবির আমি, অন্য দিক কবির তুমি। খানিকটা নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্যি যে অনেক সময়েই কবি কথা বলেন নিজেরই সঙ্গে নিজে। তাঁর একটা অস্তিত্ব

অপর অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে, বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, প্রীতি করে। এই দুইয়ের মধ্যে যাওয়া-আসাতেই কবি প্রতি মুহূর্তে অর্জন ক'রে নিচ্ছেন এক তৃতীয় সত্তা, এবং তার পর আবার নূতন ক'রে শুরু হচ্ছে নাটক। হয়তো এরই কথা ভেবে ইয়েট্স কোনো সময়ে বলেছিলেন যে কবিতায় 'ইগো' প্রতি মুহূর্তে স'রে আসতে চায় 'অলটার-ইগো'র দিকে, কিংবা এরই খানিকটা সরলীকরণ দেখি যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন তাঁর বহিরঙ্গ অস্তিত্ব মিলিত হতে চায় অন্তরঙ্গ সত্তার সঙ্গে।

অবশ্য আধুনিক সময়ের 'আমি' তো অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক আত্মজৈবনিক নয়, সে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে আত্মজীবনের বিশেষ চিহ্ন থেকে। তার ফলেই কবির অন্তর্লীন এই নাটকে অনায়াসে অংশ নিয়ে নেন পাঠক, কেননা কবিতার কোনো একটা অস্তিত্ব—আমি অথবা তুমি—পাঠকের নিজেরই খুব জানা, এমন-কী যেন নিজেই। এলিয়টের প্রুফ্রকের মধ্যে ধরা প'ড়ে আছে তাঁর জনসত্তা (public self) আর তাঁর গূঢ়সত্তা। এই জনসত্তার সঙ্গে সহজেই নিজেদের শনাক্ত ক'রে নিতে পারি, ঘ'টে যায় একটা একাত্মবোধ। কিন্তু সেইজন্যেই বলা উচিত হবে না—একজন মার্কিন সমালোচক যেমন বলেছেন—যে, এই তুমি হচ্ছে জনসঙ্ঘ।

কিন্তু কবির কোন্ অস্তিত্ব তুমি? কোন্‌টি আমি? তুমি শব্দটির মধ্যে ঈষৎ অপরিচয়ের রহস্য মাখানো আছে ব'লে প্রায়ই আমাদের ভ্রান্ত, ক্ষিপ্ত, পরিবর্তমান জানাশোনা অংশটিকেই বলতে ইচ্ছা করে আমি, তাহলেও মনে রাখা ভালো যে এই নাটকে দিক-পরিবর্তন ঘটতে পারে বারংবার। সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে' এবং আবার যখন 'আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি' তখন বলাই বাহুল্য যে এই দুই তুমিকে একই ধ্যানের আসনে আমরা বসিয়ে দিতে পারি না। 'সংবর্তে'র পরস্পর দুটি কবিতায় যখন কবি অনেকটা ব্যক্ত ক'রেই বলেন 'মর্তের প্রতিভূ আমি' 'আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট' এবং অন্যত্র 'বলেছি আমি সে-আত্মা' 'দেশকাল

আমাতে হারায়', তখন সহজেই বুঝতে পারি যে এই দুই 'আমি' একই চরিত্র অর্জন করছে না। পরবর্তী উদাহরণগুলিতে কবি একটু স্পষ্টবাক, তাই সমস্যা হয়তো কম। কিন্তু যেখানে কবিরা আরেকটু ঢেকে বলেন বা অস্পষ্ট রেখে দেন উদ্দিষ্টের চরিত্র, সেখানে কেমনভাবে আমরা শনাক্ত করতে পারি 'তুমি'কে ?

এর একটা পদ্ধতি হয়তো আছে ঐ ভ্রান্তিবিলাস শব্দে। কবির অন্তর্গত সত্তা অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, স্থির, সাম্যাবস্থায় স্থিত। পরিবর্তমান, চঞ্চল, ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট, প্রাত্যহিকের তুচ্ছতায় নির্জীবরূপে কাতর, আদর্শ অর্জনের ইচ্ছায় উৎক্ষিপ্তরূপে ব্যাকুল তাঁর প্রকৃতিচরিত্র মিলে যায় বহিরঙ্গী অস্তিত্বে। এই ভ্রষ্টতা প্রতি মুহূর্তে চলে আসতে চাইছে সংগতির দিকে। কবিতায় আমরা তাই দেখে নিতে চাই, তুমির দিকেই কি কবি এগিয়ে যান অথবা তুমিকেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমার দিকে, আর এরই থেকে অনেকটা আমরা ধরতে পারি কোন্ অস্তিত্ব তাঁর কবিতায় তুমি, কে-বা তাঁর কবিতার প্রভু বা ঈশ্বর।

প্রথম দিনের সূর্য

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

দুটি প্রবল প্রতিমা ছাড়া এ কবিতার অবয়বে আর যেন কোনো রহস্য নেই, প্রথম পাঠে এ-রকম মনে হয়। 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার' লিখেছিলেন যখন রবীন্দ্রনাথ, তখনও তাঁর এতটা সহজ, এত নিরাভরণ আয়তনের মধ্যে কথা বলবার অভ্যাস খুব বেশি তৈরি হয়েছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু এখন জীবনান্তের রচনায়, হিমেনেথ যাকে বলেন নগ্ন কবিতার সাধনা, সেইরকম দিব্য এবং নগ্ন এক কবিতাশরীর ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল এখানে। এবং এ দিব্যতা অচেতন নয়। তথ্য থেকে জানি বটে কবিতাটি বলা হয়েছিল মুখে মুখে, কিন্তু তাহলেও অবসন্ন কালের এই উচ্চারণ পরাবাস্তবের স্বপ্নময় টুকরো-ভাঙা চেহারা নয়, অটোমেটিক রাইটিংএর ভাঙা-ছড়াও

নয়, এর সমস্ত ব্যাপারটা নিবিড় শিল্পীস্বভাবেই সাজানো আছে।[১] সহজ শব্দগুলির আরেকটু ভিতর দিকে চোখ নিলে সেই শিল্পের তাৎপর্য হয়তো বোঝা যায়।

'বৎসর বৎসর চলে গেল' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে এগারো লাইনের এই কবিতাকণাটি স্পষ্ট দুই সমান খণ্ডে ভেঙে যায়। খণ্ড-দুটির দিকে মন দিলে দেখি বেশ কয়েকটি শব্দের সাম্য সত্ত্বেও তার ভিতর দিকে গাঢ়তর কয়েকটি বিরোধ উঠেছে ফুটে। প্রতিতুলনায় বসানো সেই শব্দবিরোধ লক্ষ করলে কবির অভিপ্রায়ের অনেকটা সামীপ্য পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয়।

'শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে': এটি হলো কবিতার দীর্ঘতম লাইন, পাশাপাশি ছোটো ছোটো স্পন্দিত উচ্চারণের কাছে এ লাইনটিকে শোনায় যেন ক্লান্ত নিঃশ্বাসপতনের শেষ ব্যাকুল টান, তার দীর্ঘতার যেন প্রয়োজন ছিল এখন, এখন আর নেই 'প্রথম দিনের সূর্যে'র টান-টান আপন-প্রবল ভঙ্গি। এই ভঙ্গি নিয়ে প্রথমাংশটি দাঁড়িয়েছিল অনেকটা সংহত প্রত্যাশার ভাবে, যদিও তার পরেই দেখা গেল যে উত্তর মিলল না। আর সেইজন্য তখন ভয় এসে চেপে ধরল কবির হৃদয়, বৎসর বৎসর চ'লে গেলেও কি উত্তর পাওয়া যাবে, এই জিজ্ঞাসা মনে রেখে 'দিবসের শেষ সূর্য' ফিরে আনছে আবার পুরোনো প্রশ্ন। এবং তখন, নতুন লাইনটিতে তার শিস্‌-ধ্বনির আনুপ্রাসিক ব্যবহারকে একেবারেই নির্ব্যঞ্জক মনে হয় না, দিবস শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন পশ্চিম সাগর নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—পরপর এগারোটি শব্দের মধ্যে ন'টিতেই যখন চ'লে আসে 'শ-ষ-স' এর প্রয়োগ,

---

১ এই শিল্পীস্বভাব প্রসঙ্গে এখানে স্মরণীয়: 'কবিতার কয়েকটা কথা বলে বলে কাটাকুটি করালেন। ফিরে আরেকটা কাগজে তা লিখে দিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব শুয়ে শুয়েই বুকের উপরে কবিতার কাগজটি ধরে আরও তিন জায়গায় নিজের হাতে কেটে অন্য কথা বসালেন'

তখন যেন এক প্রচ্ছন্ন চাপে লাইনটি আপনিই গড়িয়ে চলে সংশয়-ভারাতুরতার দিকে, উত্তর যে আবারও মিলবে না তা ধ্বনির মধ্য থেকেই মনে হতে থাকে। সম্ভবত এ কোনো সচেতন অনুপ্রাসও নয়; এর নিহিত ধ্বনিসাম্য এসেছে আসলে অনুভবেরই নিবিড় যথার্থতায়, বাগর্থের যোগ্য বিবাহে।

দু-অংশে ভিন্নমুখিতা আছে আরো। 'প্রথম দিনের সূর্য' কথাকটির ক্রমে সাজানো নেই 'দিবসের শেষ সূর্য'। 'প্রথম' আর 'শেষ' শব্দদুটি উভয়ত্রই সূর্যের বিশেষণ হিসেবে চাপ তৈরি করে না,—প্রথম বেলায় সে ছিল দিনেরই বিশেষণ, দ্বিতীয়টিতে সূর্যের পরিচয়। কেন এই ভিন্নতা? কবিতাটি শুরু হবে 'দিনের প্রথম সূর্য' ব'লে, এ-কথা আজ আর ভাবাই যায় না। ভাবাই যায় না কেবল এজন্যে নয় যে আমরা অন্যরকম পাঠে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এখন,—আসলে ঐ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কথাটির সীমা হয়ে আসত গুটোনো, দৈনন্দিন, গতানুগত। তাহলে বড়ো জোর আমরা এগোতে পারতাম সেই পর্যন্ত, নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র সূচনায় যে-অর্থে কবি দেখেছিলেন 'প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে'। কিন্তু চোখের উপর এই আভার প্রেরণায় সত্যের 'প্রথম উদ্‌ভাসে'র যে প্রতীক আবহমান ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ, অন্ত মুহূর্তের ছোটো এই কবিতাটি তার চেয়ে খুব স্বতন্ত্র এক অভিঘাত তৈরি করতে চায় ব'লে আমরা অনুমান করি, যখন লক্ষ করি 'প্রথম দিনের সূর্য' শব্দকটি দিনটিকে সরিয়ে নিয়ে যায় আমাদের চেনাশোনার খুব বাইরে-দূরে যেন কোনো সৃষ্টি-সূচনার মধ্যপদ্মে।

কিন্তু তাহলে কেন আবার এমনি ক'রেই এল না দ্বিতীয়াংশ, বলা হলো না 'অন্তিম দিনের সূর্য' বা 'শেষ দিবসের সূর্য'? অতি-সমতার ভারে কবিতার গৌরব তাতে কমত নিশ্চয়ই, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো কথা, এখানে প্রয়োজন ছিল দিনান্তের অস্তংগম রবিরশ্মির ছায়া দেখানো। সমস্ত কবিতার নিঃশ্বাসের জন্য এই সূর্যাস্তই তৈরি

করতে পারে উপযুক্ত আবহ এবং প্রতীক, যে-প্রতীক আবার একই সঙ্গে ব্যক্তির আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের। এ-বিষয়ে আরো অবশ্য ভাবতে হবে আমাদের, দেখতে হবে কোন্ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে কবিতাটির স্বরে, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে শব্দপরম্পরার এই কৌশল কতটা ধরতে পারল সেই স্বরভঙ্গি।

তার আগেই, 'মেলে নি উত্তর' আর 'পেল না উত্তর'-এর মধ্যে পাচ্ছি শব্দ সাজানোর তৃতীয় অমিল। এ দুটি উক্তি কি একে অপরের পরিবর্ত মাত্র? যে-কোনো একটিকেই কি দুবার ব্যবহার করা চলত ধ্রুবপদের মতো? অথবা অর্থগত সাম্য সত্ত্বেও এরা কি পরস্পর স্থান বিনিময় করতে পারত? মনে হয় না। মনে হয় না এই জন্যে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৎসর বৎসরের অন্তে এখন অনেকটা পরণতি-পরিবর্তন ঘ'টে গেছে, উত্তরে কোনো মৌলিক প্রভেদ না ঘটলেও সে-উত্তর যিনি পাচ্ছেন তাঁর চেতনায় ঘ'টে যাচ্ছে দুস্তরণীয় প্রভেদ, অনুভবের সূক্ষ্ম বদল ঘ'টে গেছে ইতিমধ্যে। 'মেলে নি উত্তরে' অতীত কালের ব্যবহার অভিজ্ঞতার একটা অসম্পূর্ণ চেহারা বলেছিল মাত্র, তদুপরি এটা ছিল বাইরের দিক থেকে, কেবল বাইরের দিক থেকে উত্তরের আশা, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নি, <u>মেলে নি উত্তর</u>। আর আজ দীর্ঘ জীবনের অবসানে কবির নিজের দিক থেকেই, নিজেরই দিক থেকে ধ্বনিত হলো কথাটি, সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেও সে কোনো উত্তর উপার্জন করতে পারল না, <u>পেল না উত্তর</u>। পাওয়া ক্রিয়াপদের ব্যবহারে পাঠকের দৃষ্টিবিন্দু স'রে যায় এখন স্থির সৃষ্টিপট থেকে কবিমনের দিকে, অনেকটা বেশি ব্যক্তিগত হয়ে আসে এই ভাবনা, 'মেলা' শব্দটিতে ছিল তার উলটো। কেবল এইটুকুই নয় 'মেলে নি' কথার ' ি' ধ্বনির চাপা টান যেন নিচু ক'রে আমাদের ধ'রে রেখেছিল ঐহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনো না মিললেও একদিন জীবনরঙ্গসীমা থেকেই মিলবে-বা কোনো উত্তর, কিন্তু এখন এই পরিণামসময়ে, হতাশ নিষ্ফলতার বোধ যেন 'না'

শব্দের প্রসারিত 'আ'-কারে লেগে মুহূর্তমধ্যে জ্যামুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এক নিরন্ত শূন্যতার অন্তঃসারে।

২

কবিতাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এগিয়ে যাই আলোর দিকে, কিন্তু এই আলোর ধরন খুব অন্য। অন্য, কেননা সূর্য শব্দটি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে এখানে ঝলমল করতে থাকে, নিছক অভ্যাসগত ব'লে মনে হয় না। এমন-কী অমনোযোগেও ধরা পড়ে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সূর্য শব্দ অথবা সূর্যের ছবি কত অসংখ্যবার ব্যবহৃত সেই বাল্যবয়স থেকে, অথচ তা সত্ত্বেও একটু বিস্ময়বোধ হয় এই দেখে যে সূর্য এখানে তেমন কোনো প্রথাবহনের ক্লিষ্টতা নিয়ে দাঁড়ায় না, প্রায় নতুন তাজা শব্দের মতোই জ্বলতে থাকে। কেমন ক'রে এটা হতে পারল?

শব্দের ক্ষমতা নির্ভর করে শব্দবন্ধের উপর। দুই শব্দের সংযোগ-প্রকৃতির মধ্যে নতুনতা সঞ্চালিত হলেই জীবিত হয়ে উঠতে থাকে পুরোনো শব্দ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল যে রবিপ্রসাদে—তার পর এই আশি বছরের কবির কাছে সূর্য-প্রকৃতিতে তেমন কোনো মৌলিক বদল দেখি না, কিন্তু এই কবিতায় সে-সব পূর্বসংস্কার হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, যখন বলা যায় 'প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল'। প্রশ্ন শব্দটির প্রত্যাঘাতে সূর্য উঠে দাঁড়ায় নূতন শব্দ হয়ে,—'এ তবে কোন্ সূর্য' এই জিজ্ঞাসার রণন গোপনে মনের মধ্যে কেঁপে যায়। তখন দেখি যে এ সূর্য প্রথম দিনের ব'লেই যে নূতন তাই নয়, প্রশ্নাতুর ব'লেও এ আমাদের অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের যে সূর্য কেবল সমাধানই বলে, যে সূর্য হিরণ্ময় অক্ষয়তার প্রতীক—এ তো একেবারেই তা নয়। প্রশ্ন এবং উত্তরহীনতার আঘাত একে অনেক ধূলিমলিন অভাগ্যের মধ্যে ফেলে দিল, আমাদের কাছাকাছি এক হৃদয়সূর্য তখন দেখতে পাচ্ছি আমরা।

মাত্র ছমাস আগেও (১১ মাঘ ১৩৪৭) যিনি লিখেছেন 'করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ', যে কেবলই 'অন্তিম রহস্য-পথ দেয় মুক্ত করি' (জন্মদিনে), যে-প্রভাতসূর্যের মধ্যে দেখ্তে চেয়েছিলেন তিনি 'আপনার শুভ্রতম রূপ/তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল' (রোগশয্যায়)—কোথায় গেল সর্বকিরণময় পাপহর সেই সূর্য? এই কবিতার সূর্য অসহায়, শুধু প্রশ্ন জানায়, প্রশ্ন শোনে না—উপরন্তু তার জানা হয় না কোনো উত্তর।

এইখানে, এখন আমাদের মনে আনতে হয় আরেকটি তথ্য যে কবি তাঁর নামের মানে পেয়েছিলেন প্রাণের মধ্যে। নামের এই প্রতীক-দ্যোতনাকে অনেক সময়ে ব্যবহার করেছেন তিনি কবিতায়, তাহলে কি এখানেও সূর্য সেই আত্মচরিত্রেরই প্রক্ষেপ? সে তো বটেই, আর সে-কথা তো আরো বুঝতে পারা যায় যখন দেখি 'দিবসের শেষ সূর্য' কথাটিও চ'লে এলো মৃত্যুপথিক বৃদ্ধ কবির যোগ্য প্রতিমা রূপে। কিন্তু বস্তুত এইখানেই এ-কবিতার একটা বড়ো রহস্য লুকোনো আছে, ব্যক্তিগত এই প্রতিমা-প্রতিমান মিশে গেছে নৈর্ব্যক্তিক বোধিরও মধ্যে। কোনো রূপক-ভঙ্গিতে নয়, একেবারেই নয়, তাহলে এর গৌরব হতো ক্ষীণ, একটা অর্থ অবলীলায় গড়িয়ে মিলে যাচ্ছে আরেক তাৎপর্যের মধ্যে, ব্যক্তিনির্ব্যক্তির ধারণাস্বভাব ক্ষণে ক্ষণে এ-কবিতার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে স্ফুরিত হতে পারছে।

কিন্তু সূর্যের প্রশ্ন ছিল কী? কার কাছে? 'সত্তার নূতন আবির্ভাবে'। এইখানেই বোধহয় পৌঁছই কবিতাটির কঠিনতম শব্দে : নূতন। প্রশ্নটি কি ব্রহ্মবিষয়ক, কেউ কেউ যেমন ধারণা করেন? তাহলে কি 'নূতন' ওখানে 'প্রথম'-এর প্রতিশব্দ? পরপর দুবার 'প্রথম' ব্যবহার করা চলত না ব'লেই 'নূতন'? কিন্তু তাহলে সেই প্রথম আদি আবির্ভাবের মুখোমুখি দাঁড়াবে কেমন ক'রে প্রথম দিনের সূর্য, তার বিস্মিত জিজ্ঞাসা নিয়ে? কেবল সত্তাই বা কেন হবে স্রষ্টার নাম?

বস্তুত সত্তা এখানে অস্তিত্বেরই পরিচয়। অনেকটা এই অর্থেই 'নূতন' শব্দের ব্যবহার ছিল 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাতেও: সেই যে নূতন তুমি/তোমার ললাট চুমি/এসেই জাগাতে/বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।—তাহলে, উদ্‌গত কোনো এক নূতনতর খণ্ডের মধ্যে চিরপ্রবাহী অস্তিত্বের এই আবির্ভাবকে নিয়ে প্রথম দিনের সূর্যের প্রশ্ন। যে বিস্ময়ে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর আপন প্রতিভাকে 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'—এ কী, কেমন ক'রে হলো—নিজেরই মধ্যে সর্বব্যাপী অস্তিত্বের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথও বলতে পারেন তেমনি—এ কে, কে তুমি? এ জিজ্ঞাসা তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না থেকে হয়ে ওঠে আত্মজিজ্ঞাসা, নিজেরই প্রতি নিজের প্রশ্ন, সত্তার নূতন আবির্ভাবের প্রতি প্রথম দিনের সূর্যের।

কিন্তু না, সম্পূর্ণ তাও নয়। আত্মচরিত্রের মধ্যে দ্বিধাভিন্ন এই দুই অংশের উল্লেখ, রবীন্দ্রনাথে এ তো কিছু নতুনও নয়। তা হলে এ কি কেবল অন্তর্যামীর লীলাকৌতুক মাত্র? না, এখানে অভীষ্ট তাকে অনেক অতিক্রম ক'রে গেছে, চ'লে গেছে জীবনযাপন বা যাপিত জীবনের প্রশ্নে। যেমন ইতিপূর্বেই দেখেছি আমরা কেমন ক'রে ব্যক্তিনির্ব্যক্তির অদ্বয় ঘ'টে গেছে কবিতাটির ভিতর দিকে, এখানেও তেমনি জানতে হবে যে নিজ অস্তিত্বের সূত্র ধ'রে এ জিজ্ঞাসা চ'লে যায় নিতান্তই সর্বময় সত্তাস্বভাবের প্রতি। আর তখন ব্যক্তিবিন্দু থেকে এই রহস্যোপলব্ধি আবার স'রে যায় ব্যাপ্ত বহির্মুখে, কবিতাটি মুক্তি পেয়ে যায় বিশ্বতোমুখ জ্যোতির্ময়তার মধ্যে।

৩

কবিতাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এগিয়ে যাই আলোর দিকে, কিন্তু এই আলোর আছে অবসান। কবিতার শেষে নেমে আসে ক্ষীণ অন্তর্জ্যোতির্লিপ্ত তমসা: নিস্তব্ধ নিরুত্তর সন্ধ্যায় দিবসের

শেষ সূর্য যে ডুবে যাচ্ছে, সে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত এক সংশয় বুকে নিয়ে গেল? তার মানে রবীন্দ্রনাথের উপান্ত্য উচ্চারণ কি পরম-অস্তি বিষয়ে সংশয়ে ছিন্ন? এ কি নিছক অজ্ঞাবাদী পরিণাম?

কবিতাটিকে ঘিরে পাঠকের মনে এ সমস্যা উঠতে পারে হয়তো—কিসের উত্তর চেয়েছিল সূর্য, কেন সে পেল না উত্তর, কার সত্য পরিচয় শেষ পর্যন্তও জানা হলো না—এ নিয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক। উপনিষদ শব্দটির পটভূমি যখনই চ'লে আসে ভাবনায় এবং যখনই রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যজৈবনিক অধ্যাত্মবিভার কথা মনে উঠতে থাকে আমাদের, আমরা ভাবতেও-বা পারি যে রহস্যময় ব্রহ্ম বিষয়ে এক জিজ্ঞাসা ভ'রে আছে এই কবিতায়। তা যদি হয় এবং যদি শেষ অবধি তার উত্তরে থাকে এক অজ্ঞান নীরবতা, বস্তুবাদী পাঠক হয়তো খুশি বোধ করেন তবে। কিন্তু বিপরীত মানসে আক্রান্ত পাঠক এই খুশিতে পৌঁছতে না দিয়ে বলবেন—যেমন বলেছেন অনেকে—এই সংশয়কে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত, বস্তুত এ সংশয়ও নয়, তাঁকে যে জানা যায় না এ কি উপনিষদও বলেন নি?

অর্থাৎ কবিতাটিকে দুই বিপরীত প্রান্ত থেকেই উপনিষদভাবনায় পড়তে অনেকে অভ্যস্ত। একজন বলেন, উপনিষদের উত্তর এখানে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে গেল, অন্যের ধারণায় প্রকারান্তরে এ-ও বৈদিক উচ্চারণের আপনগোত্র।

কিন্তু সত্যি কি তাই? কেমন ক'রে হবে? উপনিষদের ফলশ্রুতি কি এই যে তাঁকে জানা যায় না, উত্তর মেলে না? তিনি দুর্দর্শম্ বটে কিন্তু অদর্শম্ তো নন? দেবতাদেরও মনে সংশয় জাগে বটে (দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং), কিন্তু নচিকেতা তো জেনেছিলেন উত্তর—বিরজ-বিমৃত্যু নচিকেতা? 'কে তুমি—পেল না উত্তর'-এর খুব বিপরীত ধ্বনিতে কি সাজানো নেই কঠোপনিষদের সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়, যার অবিরত ধ্রুবপদ হলো 'এতদ্বৈতৎ এতদ্বৈতৎ' (তিনি এই, তিনি এই)?

এমনও নয় যে এখানে আছে উপনিষদবিরোধী কোনো ভাবনা। পরম সত্য অজ্ঞেয়, এমন কোনো অজ্ঞাবাদ এ-কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব'লে ধারণা করা যায় না, কেননা এরই মধ্যে আমরা জেনে নিয়েছি যে প্রশ্নস্থল ব্রহ্ম নন, এ-কবিতায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নেই—এ সত্তা বিচিত্রতরঙ্গময়ী জীবনলীলা মাত্র, অস্তিত্বরঙ্গ। অল্পদিন আগেই 'জন্মদিনে'র কবিতায় যে নৈঃশব্দ্যচূড়া তিনি দেখেছিলেন—'সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়', এ-কবিতার সায়ন্তনী নিস্তব্ধতা তার চেয়ে পৃথক বস্তু, তার চেয়ে পৃথক কিন্তু আরো জরুরি এক সমস্যা সে তুলে এনেছে। 'ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্তং জ্যোতিষাং পতিঃ'—উপনিষদের এই সূর্য এখন আর এ-কবিতার নায়ক নয় ব'লে এর ধারণাপরিধি খুব ভিন্ন। কবির একেবারে শেষ চারটি-পাঁচটি কবিতায় ফিরে ফিরে আসছে এই সব শব্দ : 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়' 'তপস্যা এ জীবন' 'সত্তার আবির্ভাব' 'এই হারজিত খেলা' 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি' 'তোমার সৃষ্টির পথ'—ব্যস, আর প্রয়োজন হয় না, ছলনাজালে ছড়ানো এই সৃষ্টির পথটুকুই যে এখন প্রান্তিক সমস্যা—স্রষ্টা নন—শব্দাবলির এই তালিকা থেকেও তার অনুমান হয়। নিজের এবং নিজের বাইরে অস্তিত্বের যে সমজাল বিকীর্ণ আছে, তাকে ক্রমশই কবি স'রে যেতে দেখছেন বিস্মিত অন্ধকারে, সেই অস্তিত্বের পরম স্বভাব শেষ পর্যন্ত রহস্যময় থেকে যাচ্ছে তাঁর কাছে, হয়তো সব কবির কাছেই থেকে যায় তাই।

সেইজন্য আধুনিক মন প্রবল সায় পায় এই কবিতায়, যে আধুনিক মন জানে যে সে নিজেই নিজের কাছে অন্তহীন রহস্য, আপনাকে এই জানা তার ফুরায় না। এ-বিস্ময় যে রবীন্দ্রনাথে এই নূতন তা তো বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়োপলব্ধির অন্তঃশরীরে এই যে এক নূতন বিপন্নতার বোধ আরক্তিম হয়ে উঠছে—এ কি তেমনভাবে এসেছিল আর আগে? বিপন্ন নয়, তখন তাঁর ছিল 'অক্লান্ত বিস্ময়' এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল 'রিক্ততার বক্ষ ভেদ ক'রে' সেই 'অনন্তের অক্লান্ত

বিস্ময়' আপনামাঝে ব্যক্ত হবে। কিন্তু আজ সে রিক্ততা আসছে আরেক স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে। 'নিরবধির নীরব শূন্যতা আমাকে কাঁপায়' —পাস্কালের এই ভীষণ আর্তি রবীন্দ্রনাথে নেই বটে, কিন্তু শেষ মুহূর্তের উচ্চারণে প্রায়-অনুরূপ এক নীরবতার চিহ্ন তাঁর মনকে এখন অধিকার ক'রে নিতে চাইছে। অংশের উত্তর আছে পূর্ণের মধ্যে, এক মুহূর্তের জন্য যখন এ-আশ্বাস অসম্পূর্ণ লাগল তাঁর কাছে, কেবল তখনই জীবনখণ্ড দাঁড়াতে পারল তার নিজের রহস্যে, নিজের প্রতিষ্ঠায়, নিজের মহিমান্বিত উত্তরহীনতার মাঝখানে।

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।

তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাঁবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

'প্রথম দিনের সূর্যে'র প্রায় আড়াই বছর আগে (৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮) লেখা এই কবিতা কি তারই এক পূর্বরূপ নয়? ঠিক, প্রথম মনে হয় এটি ঐ কবিতারই ভাষ্যমাত্র, প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য—কিন্তু ক্রমে দেখা যায় দুটি রচনায় মিলও যেমন, ভিন্নতাও তার চেয়ে কম নয়। এবং এই ভিন্নতা লক্ষ করলে বুঝতে পারি অকবিতার অংশগুলি কেমন নির্মমভাবে সরিয়ে দিলে ক্রমে জন্ম নিতে পারে একটি শুদ্ধ কবিতা।

'প্রশ্নে' সেই শুদ্ধতা এবং অনিবার্যতা নেই মনে হয়, 'প্রথম দিনের সূর্যে'র যা গৌরব। ভাবাই শক্ত যে এই কবি এক সময়ে জানিয়েছিলেন, বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাণিত করতে জানে। শেষ দশ বছরের কবিতায় খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন তিনি! এবং কত সময়ে মনে হয়েছে এ-কথা কেন কবিতায় বলতে হবে, এর মধ্যে কী আছে যা গদ্যেরই পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়? যেমন এই রচনাটির কিছু অংশ; 'এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,/পুঞ্জিত, নর্তিত।/এরা সত্য কী যে/বুঝি নাই নিজে।/ বলি

তারে মায়া—/যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া। / তার পরে ভাবি···' ছন্দ আর মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে যা কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, অনিবার্য, যা কেবলই গদ্য নয়? এখানে প্রতি দুই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে কোনো রহস্য নেই, খাদ নেই, শব্দের পরস্পর-গ্রন্থনে কোনো জ্ব'লে ওঠা নেই, এমন কোনো অবসর নেই যার হাওয়ার মধ্য দিয়ে খেলিয়ে নেওয়া যায় মন। 'হয় আবর্তিত, / পুঞ্জিত, নর্তিত' বা 'এরা সত্য কী যে / বুঝি নাই নিজে' এর শব্দ-পরম্পরাও বাঁধা আছে কেবল মিলেরই বিধায়, আর কবি সেটা পাঠককে প্রায় জানতেই দেন। 'সত্তার নূতন আবির্ভাবে' এবং 'বৎসর বৎসর চলে গেল' মাত্র এই দুটি শব্দগুচ্ছের পরস্পর-সংঘর্ষেই দেহী অভিজ্ঞতার যে ব্যাপক আভাস ছায়াচ্ছন্নরূপে রচিত হয়ে যায়, তাকেই খুলে দেবার জন্য এই কবিতার উক্ত অংশে এত আয়োজন—কিন্তু এই খুলে দেওয়া বোধ হয় কবিতার কাজ ছিল না।

কবিতাটির মধ্যে আছে প্রতিন্যাসে সাজানো দুই রূপ, প্রথমে মনে হয় যেন অলংকার, কিন্তু ক্রমে তা হয়ে ওঠে বিষয়েরই অংশ। চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্পের মধ্যে শূন্যের কেন্দ্রে ঘনিয়ে ওঠে তারাপুঞ্জ, যেমন অসংখ্য বৎসরে স্মৃতি আর বিস্মৃতিবিস্তারের বাষ্পপরিবেশের মধ্যে রূপে রূপান্তরে ঘনিয়ে ওঠে 'আমি'। এইভাবে 'আমি'র এক বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিত রচনা ক'রে রাখল শূন্যস্থিত তারাপুঞ্জ। কিন্তু এ-দুটি কথাকে কাছাকাছি রাখা যায়নি, আনতে হয়েছে পৃথক দুই স্তবকে, কারণ এই সাদৃশ্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে এই কথাও যে বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসার সফলতা শেষ পর্যন্ত কত অসহায়, একজন আইন-স্টাইনকেও হয়তো কত নিরুত্তর থেকে যেতে হবে সত্তার প্রশ্নে, আমির প্রশ্নে। পণ্ডিতজন অভাবনীয় দূর জগতেরও বেগ তাপ ভার আয়তনকে 'সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন', কিন্তু—

এই অনুচ্চারিত অনুপস্থিত এক 'কিন্তু' শব্দে শুরু হলো দ্বিতীয় অথবা মূল স্তবক। পূর্বস্থিত ছটি লাইনের ভারি শব্দগুলি, দূরত্ব,

মহত্ত্ব আর অপ্রাপণীয়ত্বের সঙ্গে সংগ্রামের ঘটা এক নিশ্বাসে ব'লে-যাওয়া চার লাইনের একটি দীর্ঘ বাক্য—এবং তার ঠিক পরেই একটু থেমে (: স্পেস) ছোটো ক'রে বলা 'আপনার পানে চাই/লেশ মাত্র পরিচয় নাই'। তুলনায়-দীর্ঘ কবিতাটির এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্য -ব্যবহারের খেলায়, বিপরীতে সাজানোর এই কৌশলে হঠাৎ বুক দ'মে আসে, পরিচয়হীনতার পরিমাপ জেনে হঠাৎ সব ঝাপ্‌সা লাগে। কিন্তু মুহূর্তেই কবি সরিয়ে নেন মায়াজাল, তার পরেই শুরু হয় বিস্তারিত বিশ্লেষ, পাঠকের অনুভবের দায়িত্ব নিয়ে নেন কবি নিজেই। এতই, যে শেষ দিকেও আবার ফিরিয়ে আনেন প্রতি-তুলনাটি : 'তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত'···ইত্যাদি। এতই, যে বারংবার সশব্দে মনে করিয়ে দিতে হয় অদৃশ্য অসীম পরিবেশের কথা, আটাশ লাইনে অন্তত দশবার ঘুরিয়ে আনতে হয় এইসব বিশেষণ : দৃশ্যাতীত অজানা অসংখ্য অব্যক্ত অজ্ঞেয় অসীম অপার। অনুচ্চারিত নৈঃশব্দ্যে যে অপারতার মণ্ডল রচিত হয়েছিল 'প্রথম দিনের সূর্যে', এখানে সে শব্দাসীন, এবং সেইজন্যেই তাকে ধরতে পারি কম।

যেমন দেশ (space)-গত বিস্তারের জন্য এ-কবিতায় 'আমি'র বিপরীতে আছে মহাকালচক্রপথের তারাপুঞ্জ, তেমনি ঐ সঙ্গে কাল-বিস্তারের আভাসেও এখানে আছে এক ব্যাপকতার টান, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ। 'বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তারে'র মধ্য দিয়ে যে অতীতকে স্পর্শ করা যায়, সে ক্রমে অসংখ্য বৎসরে গ'ড়ে তোলে 'তার সত্তাদেহ', কিন্তু সে কেবল এইজন্যই যে এই দেহ একদিন 'অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি'। এই শেষ বাক্যটির পরবর্তী দশ লাইনে পাঁচটি ক্রিয়াপদ ভবিষ্যৎকালে বাঁধা, তাই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রবাহ সত্ত্বেও এ-কবিতার মূল 'নিরর্থকতা'র প্রশ্ন তার চাপ সরিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্য ; যেন জ্ঞানত জেনে নেওয়া গেছে সমূহ সংশয়, কিন্তু তার আলোড়নের প্রত্যক্ষতা এখনো আসে নি সামনে।

তাই কখনো-বা মনে হতে পারে 'প্রশ্ন' কবিতা এক নিদারুণ ভবিষ্য-কথন, বিশেষত এর শেষ লাইন যদি লক্ষ্যে রাখি। 'ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর' 'বাজিতে থাকিবে শূন্যে' এর মধ্যে শান্ত উচ্চারণে যে নির্দয় ভবিষ্যতের শঙ্কা, অন্তকালীন কবিতাটিতে তা-ই পূরিত হলো, অতীত ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন কবি, না, মিলল না উত্তর। 'বুঝি নাই নিজে' এই টুকরো একটি আলতো কথা ছাড়া 'প্রশ্নে' কোনো ক্রিয়াপদগত অতীত নেই, সবই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—'প্রথম দিনের সূর্যে' সবই ক্লান্তশ্বাস অতীত। তাই দুটি কবিতার মুখ দুদিকে ঘোরানো : এ-দিক থেকে রচনার বিষয়গত সাদৃশ্যও স'রে যায়।

এই বৈসাদৃশ্য যে কেবলই কালবিষয়ক তা নয়, অভিজ্ঞতার ব্যবহার বিষয়েও বটে। 'আপনার পানে চাই' ব'লে যে 'আমি'টিকে এই কবিতার কেন্দ্রে রাখেন কবি, সে এক ব্যক্তিগত আমি। যে সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষের উপাদান নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ, তার সত্যরূপ কবি বোঝেন না, তাই এই 'সত্তাদেহ' থেকে যায় অজানা আর অজ্ঞেয় এবং লুপ্তি-মুহূর্তে সে মিলে যায় আরেক অজানা অদৃশ্য স্রোতে। অতএব এই কবিতায় সত্তা কথাটি কোনো বৃহত্তর অর্থে আসে না, সহজ সমাসেও তাই বাঁধা পড়ে 'সত্তাদেহ', এ সত্তা কেবল দেহী রূপ, এবং তার অধিষ্ঠাতা 'আমি'ও আছে কেবল আত্মবোধে বাঁধা। 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতায় 'সত্তার নূতন আবির্ভাবে' কথাটির সঙ্গে সঙ্গে 'সত্তা'-শব্দ যেমন মহনীয় দ্ব্যর্থকতা পেয়ে যায়, যেমন একই সঙ্গে ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং সমগ্রতার অস্তিত্বভার মিশে যায় সেখানে, যেমন এই একটি শব্দেই আশ্রয় পেয়ে যায় 'প্রশ্ন' কবিতার দুটি অজানা (কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি) বা দুটি অজ্ঞেয় (এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি) এবং ক্রমশই এ-কবিতার ভিতর দিকে যেমন ব্যক্তিনির্ব্যক্তির অচ্ছেদ্য সূত্র রচিত হতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে আরো ঘন, আবহময় এবং

জটিল তাৎপর্যে ভরা—এখানে তেমন কিছু ঘটে না, এ-কবিতা থেকে যায় অনেক সহজবোধ্য, অদ্ব্যর্থ এবং সেই কারণে কিছু-বা প্রভাহীন।

রচনাদুটিকে আরো স্বতন্ত্র ক'রে দেয় এদের অন্তঃস্থ স্বরভঙ্গি, বা টোন্ (রিচার্ড্সের অর্থে নয়, বরং রিচার্ড্স যাকে বলবেন ফীলিং, এ হলো তাই)। বিষয়গত সমীপতা সত্ত্বেও কেবল স্বরের জন্যই দুটি লেখা কত ভিন্ন কবিতা হয়ে উঠতে পারে, এখানে তার উদাহরণ আছে। কবিতায় স্বরভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যকে সম্মান না ক'রে পারেন না আধুনিক পাঠক।

'সুতীব্র আর্তস্বর' কথাটি ব্যবহৃত আছে 'প্রশ্ন' কবিতায়, কিন্তু সেই তীব্রতার কোনো রণন আমাদের পৌঁছে দেয় না লেখাটি। ওগুলি শব্দ মাত্র, চিন্তা বা অনুভবের ব্যাখ্যাত অংশ,—ঐ শব্দের কোনো প্রগাঢ় ধ্বনি কবিতাটিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। যেন খুব স্থিরভাবে 'আমি'র পরিচয়-এষণার একটি ইতিহাস লেখা হয়েছে কবিতা জুড়ে, সেই ইতিহাস এবং বিশ্লেষণ লক্ষ করতে করতে আমাদের মন অনেকটা নির্লিপ্ত হয়ে আসে, হঠাৎ কোনো বেদনা দিয়ে আঘাত করবার মতো অবস্থা আর নেই। কবিরও যেমন এখানে শীতল বিবেচকের ভূমিকা, আর্ত বিস্মিতের নয়—অপীড়িত পাঠকের পক্ষেও তাই, সেও কেবল জানতেই পারে যে এখানে এমন প্রশ্নের উত্থাপন আছে যা আর্তিসহ কেবলই বাজবে, কোনো উত্তর মিলবে না ; কিন্তু এই জানার ফল হিসেবে কোনো রোমাঞ্চ লাগে না তার, অথবা তাকে নিয়ে যায় না অন্য কোনো তীব্রতর ভয়ের দিকে।

তাই বলা যায়, বিস্ময় আর বিস্ময়োপলব্ধির অন্তঃশরীরে যে বিপন্নতার স্বর 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটিকে ধ'রে রেখেছিল, এ-কবিতার ভিতরচরিত্রে তা নেই। অবিপন্ন এই কবিতায় যে-কথা রাখা আছে কেবল শব্দে, 'প্রথম দিনের সূর্যে' তারই পরিণাম ঘটে স্বরে। স্বর-সংহতির কৌশলে স্ফটিকতুল্য ঐ ছোটো কবিতায় একবারও 'সুতীব্র আর্তি' বা অনুরূপ কোনো শব্দবন্ধ না এনে কবি তাকে

আর্তিতায় বাজিয়ে দেন, সংযমিত স্বল্পভাষী অব্যর্থ কবিতা তার ঠিক স্বরটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। আর 'প্রশ্ন' দেয় স্বরের বদলে শব্দ, অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বাণী। তাই এ কবিতা পড়বার পরেও 'প্রথম দিনের সূর্য'কে মনে হতে পারে একেবারেই নতুন, এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আইয়ুবের সঙ্গে বিচার

আবু সয়ীদ আইয়ুব

'বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাণিত করতে জানে'—বলেছেন শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের দোহাই পেড়ে। কবিতার সঙ্গে গদ্যের প্রভেদ একটা আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রথমত, সে-প্রভেদ এই নয় যে কবিতা কিছু না-বুঝিয়েই প্রাণিত করে, আর গদ্য বোঝায় কিন্তু প্রাণিত করে না কখনো। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের এই দুই বিভাগের মাঝখানে কোনো অলঙ্ঘ্য কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হয় নি সর্বকালের মতো, সর্বাবস্থার জন্য, সর্বসম্মতিক্রমে। আনাগোনা, সীমানা-সরহদ্দের রদবদল চলছে হামেশাই। গদ্য দরকার পড়লে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে—যেমন উপনিষদ, প্লেটো আর বের্গ্‌সঁর দর্শনে, গিবন মমসেনের ইতিহাসে, তুর্গেনেভ, লরেন্‌স্‌ আর জয়্‌সের উপন্যাসে, মোপাসাঁ আর রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে। কবিতা আপন অন্তরের তাগিদেই গদ্যকে বুকে টেনে নেয়—তার উদাহরণ হোমর, ভার্জিল, ব্যাস, দান্তে, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, এলিয়ট এবং রবীন্দ্রনাথে অজস্র ছড়ানো রয়েছে।

বোঝানোর একটি অর্থ একজনের মনের কথা আর-একজনের মনের দেউড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কথার শুধু হৃৎস্পন্দনটুকু নয়, বহির্জগতের যে-বস্তু বা অবস্থার অভিঘাতে সে-হৃদয়াবেগের জন্ম এবং যার বহমান চেতনার সঙ্গে তার পরিপুষ্টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেই সমগ্র উপলব্ধির মন থেকে মনান্তরে সঞ্চার—এই অর্থে বোঝানোর

দায়িত্ব কবি না নিলে আর কে নিতে পারে? অনুভূতি বাদ দিয়ে বিষয়ের যে-নিরঞ্জন সত্তা, তার যথাযথ সংবাদবহন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সদৃশ গদ্যের কাজ; বিষয়টাকে উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র তার অনুভূতি-টুকু ছেঁকে নিয়ে সে-অনুভূতির বিস্তারিত অভিব্যঞ্জনা সংগীতে পাই আমরা। এ-দুয়ের মাঝখানে পড়েন কবি। এক দিককার দায়িত্ব এড়াতে গেলে তিনি বৈজ্ঞানিক (বা দার্শনিক কিংবা ঐতিহাসিক) হয়ে পড়বেন, পদ্য ছেড়ে গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন; অন্য দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইলে তাঁকে হতে হবে সংগীতকার, কলম ছেড়ে আঙুলে পরতে হবে মেজরাব।

কবিতার গভীর তলে যে-অর্থ লুকানো থাকে তার সন্ধানে ডুব দিতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম; আজ শুনছি তার উপরিতলে যে স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির মোহিনী মায়া বিস্তৃত সেখানেই কবিতার সারাৎ-সার খুঁজতে হবে। আমরা ভুলতে বসেছি যে অর্থের গরবেই কথা গরবিনী। অবশ্য উঁচু দরের গাইয়েরা সে-গরব উপেক্ষা ক'রে যে-কটি কথার উপর রাগ-রাগিণীর বিস্তার করেন তার অর্থ যৎসামান্যই হয়, অনেক সময় কালোয়াতী গানের কথা ঠিকমতো বোঝাই যায় না। কিন্তু অর্থের দৈন্য ঘোচাবার জন্য থাকে কণ্ঠের ঐশ্বর্য আর আজীবন সুরের সাধনা। মালার্মে-ভালেরির প্রদর্শিত পথে যদি কবিতাকে সংগীতের পর্যায়েই তুলতে চান আধুনিক কবিরা তাহলে সংগীতের বলিষ্ঠ পরিণত আঙ্গিকের চর্চা করতে হবে তাঁদের। শুধু কবিতার বাচ্যার্থের উপর কাঁচি চালালেই সাংগীতিক ব্যঞ্জনার জামা তৈরি হবে ভাবাটা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং পাঠককে বঞ্চিত করা। ইতিমধ্যে সেক্সপীয়র কিংবা রবীন্দ্রনাথ কথার যে অপরিমেয় শক্তি-উৎসের সন্ধান দিয়ে গেছেন তার ভগ্নাংশমাত্র বেছে নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবাদের মতো বলা কি সাজে—বাকিটা সকড়ি, ওতে গদ্যের ছোঁয়া লেগেছে? ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার, আচারের নয়; কবির ধর্মও—কবির ধর্ম তো বিশেষ ক'রে। গদ্যের ছোঁয়া বাঁচাতে গিয়ে পাঠকের ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন না

কি আধুনিক কবিরা? আমি অবশ্য অকবি পাঠকের কথা ভাবছি। কবিরাই কবিতা লিখবেন, পড়বেন এবং সমালোচনা করবেন—এটাকেই যদি স্বাভাবিক ঠাওরানো হয়, তাহলে কিছু বলবার নেই।

ভাষার এ-পারে আছেন লেখক, ও-পারে পাঠক। মাঝখানে যদি বোঝাবুঝির সেতুবন্ধন না হয়, তবে বলতেই হবে একপক্ষের বা উভয়পক্ষের দোষ ঘটেছে; পাঠক আনাড়ি বা নির্বোধ হতে পারেন, লেখকও আনাড়ি বা একগুঁয়ে বা অসদ্‌গুরু-চালিত হতে পারেন; অথবা উভয়ত। কবি যখন ভাষাশিল্পী তখন বোঝানোর, অর্থাৎ সম্পূর্ণ উপলব্ধিকে কমিউনিকেট করার, দায়িত্ব কবিকর্মেরই অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ কখনো এ দায়িত্ব এড়াননি। কিন্তু বোঝানো মানে প্রমাণ করা নয়। সে ঝুঁকি বৈজ্ঞানিকের, ঐতিহাসিকের, দার্শনিকের। কেউ শেষ অবধি কিছুই তর্কাতীত রূপে প্রমাণ করতে পারেন না—প্রমাণ কাকে বলে সে-বিষয়েই অনেক মত। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই এঁদের, অণোরণীয়ান্ থেকে মহতোমহীয়ান্ যাবতীয় বস্তুর মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছেন গহ্বরেষ্ঠ তথ্য, বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী, আরোহী ও অবরোহী যুক্তির সোপান বেয়ে উঠছেন প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, বিশেষ থেকে সামান্যে, বহু থেকে একে। কবি কিন্তু ব'লেই খালাস। কোনো প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করার গরজ নেই তাঁর, কারণ প্রয়োজন নেই। প্রমাণ না দিয়েই মানিয়ে নেওয়ার অর্থাৎ মনে ধরাবার কৌশল তাঁর জানা আছে। তাকেই বলে কাব্যকৌশল। রবীন্দ্রনাথ যদি ব'লে থাকেন 'বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার', তবে নিশ্চয়ই এই অর্থেই বলেছিলেন।

'নবজাতকে'র 'প্রশ্ন' কবিতাটিতে কয়েকটি গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি আবিষ্কার ক'রে শঙ্খ ঘোষ রায় দিয়েছেন ওটা কবিতাই নয়, 'শেষ লেখা'র ১৩ সংখ্যক কবিতার প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য। একদিন ছিল যখন অ-কবিজনোচিত শব্দ কবিতায় স্থান দেওয়ার কথা ভাবলে আঁতকে উঠতেন কবিরা। আজ শুধু অকবিজনোচিত নয়, রীতিমতো

অভদ্রজনোচিত শব্দের উপর পক্ষপাত জন্মে গেছে কবিদের। কিন্তু কবিতার মধ্যে অকবিজনোচিত পঙ্‌ক্তি, এমন পঙ্‌ক্তি যা গদ্য ব'লে ভুল হতে পারে? সর্বনাশ, জাত যাবে যে!

বড়ো দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলাম শঙ্খ রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতাকে এই কারণে জাতিচ্যুত ব'লে বিচার দিয়েছেন। এমনি এক বিচার প্রত্যাসন্ন জেনে কি রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই বলেছিলেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন'? শেষ দশ বছরের রচনায় রবীন্দ্র-প্রভিভা এমন অমোঘ, এমন দুঃসাহসিক যে, কোনো শাস্ত্রের নির্দেশ, আচারের বাধা, গণ্ডির বেড়া মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি; পদ্যে এনেছেন গদ্যের ঋজুতা, গদ্যে এনেছেন পদ্যের স্পন্দন, বোধিকে করেছেন বেদনাময়, তত্ত্বকে করেছেন প্রাণস্পন্দিত। বেদ-উপনিষদের, বাইবেলের, রুমীর মসনবীর, হাফিজের গজলের শ্রেষ্ঠ অংশ যেমন শুদ্ধ কবিতা হয়েও শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনার শ্রেষ্ঠ ভাগও তেমনি কবিতার চেয়ে বেশি হয়েও কবিতার চেয়ে কম নয়। শুধু বৈদিক গাথা বা উপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভুল হবে। নিতান্ত মানুষী প্রেমের কবিতাও রবীন্দ্রনাথের ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়সের রচনাতে গুণে ও গণনায় বিস্ময়কর, অন্য কোনো দশকের সঞ্চিত ভাণ্ডার তাকে সহজে হার মানাতে পারবে ব'লে আমার মনে হয় না।

> 'It seems as one becomes older, that the past has another pattern and ceases to be a mere sequence or even development: the latter a partial fallacy encouraged by superficial notions of evolution, which becomes, in the popular mind, a means of disowning the past.'

উদ্ধৃত বাক্যটি কোনো দার্শনিকের সুলিখিত প্রবন্ধ-সংকলনে পাওয়া যাবে না। গেলে একটুও বেমানান ঠেকত না, তবে কোনো পাঠকের

চোখে তার গভীর কাব্যিক তাৎপর্য ধরা পড়ত না। টি. এস. এলিয়ট এই জটিল দীর্ঘ গদ্য বাক্যটিকে পাঁচটি পঙ্‌ক্তিতে ভাগ ক'রে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির গোড়ায় বড়ো অক্ষর বসিয়ে Four Quartets-এর ২৮ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত করেছেন। সেখানেও বেসুর বাজেনি। এমনি আরো গোটা পনেরো গদ্যবাক্য ছড়ানো রয়েছে ঐ নাতিদীর্ঘ কাব্যে। কোনো সুধী পাঠক বা কবি-সমালোচক এই 'অকবিতার অংশগুলিকে নির্মমভাবে বাদ দিয়ে' কাব্যখানিকে 'শুদ্ধ' করার প্রস্তাব তুলেছেন ব'লে তো শুনিনি।

'তুমি যাকে বলো সুন্দর তা বহুরূপী পঞ্চভূতে, চিত্রল উদ্ভিদে কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে নেই, আছে শুধু আমারই অহমিকায়'—এই দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী দার্শনিক গদ্যবাক্যে কয়েকটি শব্দের স্থান অদল-বদল ক'রে বুদ্ধদেব বসু তাকে পদ্য করেছেন। সেটা কিছু নয়, যে কোনো গদ্যবাক্যকে সামান্য বদলে দিলে তা পদ্য হতে পারে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই (কিন্তু কেনই বা আশ্চর্য হব ?) যখন লক্ষ করি যে এই তত্ত্ববাক্য এবং আরো কয়েকটি বাক্য একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা 'মরত্ব সংগীত'এর অঙ্গীভূত। যা গদ্যে বলা যায়, যা ছন্দোবদ্ধ গদ্যেই বলা হয়েছে, এমন সমস্ত কথা কবিতা থেকে বাদ না দিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা জাতিচ্যুত ব'লে ধার্য হবে—সে অশুভ দিন আশা করি সাহিত্যে কখনো আসবে না। কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্য বা গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি থাকলেই তার মূল্যহানি ঘটে না। পঙ্‌ক্তিগুলি কবির অক্ষমতাপ্রসূত, না বিশেষ অনুষঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আনা হয়েছে, তারা কবিতাকে পূর্ণতা দান করছে না খণ্ডিত করছে—এটাই বিচার্য। পঙ্‌ক্তিবিচার কাব্যবিচার নয়।

যে-পঙ্‌ক্তিগুলিতে শঙ্খ 'ছন্দ আর মিল ছাড়া' আর-কিছুই খুঁজে পাননি, 'যা কবিতা হিসাবে গ্রাহ্য, অনিবার্য, যা কেবলই গদ্য নয়,' পূর্বানুষঙ্গসহ 'প্রশ্ন' কবিতার সেই অংশটা উদ্ধৃত করছি :

বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতিবিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে-রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।

এই কটি পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বহু দার্শনিক মত ও জিজ্ঞাসা সংহত করেছেন ; সে-সব কথা গদ্যে বুঝিয়ে বলতে গেলে শতাধিক পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ রচনা করতে হয়। আমির রহস্য সম্পর্কে উপনিষদকারদের এবং সক্রেটিসের সময় থেকে জিজ্ঞাসা ও গবেষণার শেষ নেই ; কত মতবাদ গ'ড়ে উঠেছে ও ভেঙে গেছে বা ঈষৎ ভগ্ন দশায় এখনও টিকে আছে, মনের কত দিক, কত গ্রন্থি, কত স্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে অনুদ্‌ঘাটিত সত্যের তা ভগ্নাংশমাত্র। জানা ও আধো-জানা সব কথা বলার পরও আমাদের প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয় যে কিছুই বলা হয়নি ; সবচেয়ে সত্য যে-'আমি', জ্ঞাতা বা সাক্ষী 'মনেরও মন,' তার সম্বন্ধে যে বলার মতো কিছু বলা হয়নি শুধু তাই নয়, কিছু বলা সম্ভবই নয় ; সে-'আমি' আক্ষরিক অর্থে অনির্বচনীয়। আরো একটা কথা এবং এ-কবিতাটি বুঝতে হ'লে সেটাই বড়ো কথা। মনের অনেক কিছু জানা নেই যেমন, তেমনি অণুপরমাণুর, নক্ষত্র-নীহারিকারও অনেক কিছু জানা নেই। কিন্তু মস্ত প্রভেদ এই যে আত্মা সম্বন্ধে যখন কিছু বলি বা ভাবি তখন অজানা অংশ একেবারে বাদ যায় না : 'আমি' যে আমিই, তার চেয়ে নিকট, তার চেয়ে

অন্তরঙ্গ, তার চেয়ে সত্য তো আর কিছু নেই। সুতরাং যা বলতে বা ভাবতেও পারি না, 'আমি'র সেই বিরাট অব্যক্ত অর্থ যেন ছায়ার ছায়া হয়ে আমাদের ব্যঞ্জনা ও ভাবনার সঙ্গে লেগে থাকে। আমার তো মনে হয়, " 'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্রমাঝে অসংখ্য বৎসরে" কিংবা 'যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া'—এমন অর্থঘন পঙ্‌ক্তি ফোর কোয়ার্টেট্‌স-এর মতো কবিতায়ও দুর্লভ। আর যাই হোক, এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়, কারণ বিশুদ্ধ গদ্যে ঐ বক্তব্য একটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করা যায় না।

অবশ্য এগুলি বিশুদ্ধ কবিতার পঙ্‌ক্তিও নয়—সেই অর্থে যে-অর্থে 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি'র পঙ্‌ক্তি বিশুদ্ধ কবিতা। সে-রকম কবিতা তো রবীন্দ্রনাথ কম লেখেন নি। শেষের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে তিনি অন্য পথ কাটতে চেয়েছেন, কেটেছেন। একই মানদণ্ডে দুই বিভিন্ন কাব্যমার্গের বিচার সংগত নয়। এটাও ভেবে দেখা দরকার যে এই আপাতগদ্য বাক্যগুলিকে আরও আবছা ক'রে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ঢেকে দিয়ে বলা কি রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে একটুও শক্ত ছিল? বরঞ্চ সেই অভ্যাস ও প্রলোভন ত্যাগ করতে হয়েছে কষ্ট ক'রে, বহু যত্নে গদ্যের ঋজুতা ও অপরোক্ষতা তিনি এনেছেন শেষ পর্বের অনেক কবিতায়, কারণ এ-কবিতাগুলি ভিন্ন জাতের, ভিন্ন উপলব্ধি-সঞ্জাত।

'নবজাতকে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভিতর থেকে মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' এই 'মননজাত অভিজ্ঞতা' আধুনিক বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান—থেকে লব্ধ। এমনতর বৈজ্ঞানিক মনন যে হৃদয়াবেগ জাগিয়েছিল তাকে নিয়েই কবিতা। কিন্তু সে-কবিতা থেকে মননকে তো একেবারেই ছাঁটাই করা যাবে না। আর মননকে ঠাঁই দিতে গেলে তার বাহন সেই ভাষা যা গদ্যের খুব কাছাকাছি—তাকে খিড়কি দরজার ফাঁক দিয়ে কখনো ছন্দে সজ্জিত ক'রে, কখনো বা বিনা সাজে ঘরে ঢুকতে দিতেই হবে।

অথচ সেই গদ্যপ্রতিম পঙ্‌ক্তিগুলিকে ধারণ ক'রে আছে একটি নিঃসন্দিগ্ধ কাব্যানুভূতি, সমগ্র কবিতায় যা অভিব্যক্ত।

'নবজাতকে' রবীন্দ্রনাথ কবিতার পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন, পা বাড়িয়েছেন বিজ্ঞানের খাসমহলে। এ-ধরনের মননজাত অভিজ্ঞতায় যাঁদের অরুচি, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব তাঁদের কাছে স্বভাবতই অপাঙ্‌ক্তেয় ঠেকবে। তা নিয়ে কোনো পক্ষের নালিশ না থাকাই ভালো। বিভিন্ন কারণে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র অভিজ্ঞতা একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো সুকবির অনধিগম্য ছিল, কাজেই ঐ কাব্য-গুলি হয়েছিল তাঁর শাণিত লক্ষ্য।

২

'শেষ লেখা'র ১৩ সংখ্যক কবিতার প্রশ্ন ('কে তুমি') কার উদ্দেশে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন করেছিল 'প্রথম দিনের সূর্য'। সূর্যকে জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের প্রতীক ধরা যেতে পারে, ধরা হয়েই থাকে ; সব দেশেই জ্ঞানের উপমান আলো। প্রশ্ন করা হয়েছিল পরম সত্তাকেই, কবিতাটি যদি এই ভাবেই বুঝি তাহলে নূতন আবির্ভাবের মানে করতে হয়—যখন পরম সত্তা প্রথম আবির্ভূত হল মানবচৈতন্যে। প্রশ্নের কি কোনো উত্তর নেই? কয়েকটি উত্তর তো কবিতার মধ্যেই দেওয়া হল। পরম সত্তার আবির্ভাব ঘটে এবং অনাবির্ভূত বা আমাদের অজ্ঞাত রূপেও তা সত্য ; বারে বারে আবির্ভাব ঘটে, নইলে নূতন আবির্ভাব বলা হল কেন? মানব-চৈতন্য নির্বাপিত হ'লেও ('দিবসের শেষ সূর্য') পরম সত্তার বিনাশ নেই। এতগুলি উত্তর পাওয়ার পরও 'মেলে নি উত্তর' বলা এবং তার পুনরুক্তি 'পেল না উত্তর' কি সংগত? এর চেয়ে বেশি আর কী উত্তর প্রত্যাশিত ছিল, আর কী উত্তর দেওয়া হয়েছে উপনিষদে—পরম সত্তা ও সূর্যপ্রতিম চৈতন্যের ধারণা যেখান থেকে গৃহীত? আর একটি উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় সেখানে। পরম সত্তা উপনিষদের ভাষাতেই

উত্তর করতে পারতেন—আমি তোমার মধ্যেও সত্য অতএব নিজেকে জানো (যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি, আত্মানং বিদ্ধি, ইত্যাদি)। এই উত্তরকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন সর্বান্তঃকরণে সত্য ব'লে জেনেছেন, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হঠাৎ তার প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন এমন অনুমানের সমর্থন পাই না তাঁর শেষ বয়সের কাব্যে। না, কবিতাটিতে ব্রহ্মসংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রত্যাখ্যান নেই—এ বিষয়ে আমি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে একমত।

তবে কি প্রশ্ন করা হল নূতন আবির্ভাবকেই—'আবির্ভাব' অর্থ আবির্ভাব-কালে নয়, আবির্ভাবকে ? সত্তা এবং আবির্ভাব, **reality** এবং **appearance,** এই দ্বৈতের কথা তোলা হয়েছে তাহলে। এই নামরূপময় জড় শক্তির লীলাস্বরূপ প্রত্যক্ষ জগৎকেই (এবং তার অঙ্গীভূত মানব-জীবনকে) কবি জিজ্ঞাসা করেছেন—কে তুমি। প্রতীয়মান জগতের অনেকটা পরিচয় পাই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, সাধারণ মানুষের অনুমানে ; সুষ্ঠুতর, পূর্ণতর পরিচয় পাই বিজ্ঞানে—জড়, জীব ও মনোবিজ্ঞানে। এ-পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়, অভ্রান্ত নয়, সংশোধনীয়, পরিবর্তমান, আপন পরিধি ও গভীরতা যুগে যুগে বাড়িয়ে চললেও কোনোদিন সম্পূর্ণ বা সংশয়রহিত হবে না—এ-সব তো বিজ্ঞানের ও দর্শনের মামুলিতম, জীর্ণতম উক্তি। রবীন্দ্রনাথ কি তারই পুনরুক্তি করতে চেয়েছেন, 'মেলে নি উত্তর' ব'লে ? এই স্ফুলিঙ্গের মতো দীপ্তিমান কবিতার এমন চর্বিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমার মন সায় দেয় না।

একটি কথা এ কবিতার ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে অনেকে লক্ষ করেন নি বোধ হয়। আলোচ্য প্রশ্ন 'কী তুমি' বা 'কেন তুমি' নয়, 'কে তুমি'। 'কী তুমি' প্রশ্নটাতে জানতে চাওয়া হয় তোমার যাবতীয় গুণ ও ধর্ম, হেতু ও নিমিত্ত, আকার ও আয়তন, গঠনের উপাদান ও প্রণালী, ইত্যাদি। এ প্রশ্ন সমস্ত বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যে তোলা যায়, দার্শনিকেরা তুলেই থাকেন, কবির মনেও উঠতে পারে

অনায়াসে। কিন্তু কবিতায় এ প্রশ্ন কেউ কাউকে করে নি। কবিতার প্রশ্নটি হল 'কে তুমি'। প্রশ্নটি সনাক্তের, আইডেন্টিটির—এতগুলো লোকের মধ্যে কোন্ বিশেষ লোকটি তুমি, এমন কী পরিচয় আছে তোমার যাতে অন্য দশজনের মধ্যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই চেনা যায়? এই প্রশ্ন সমগ্র বিশ্বসত্তাকে করার কোনো মানে হয় না। করা যায় ব্যক্তিবিশেষকে, ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঁচ-ছয় বছরের বালক খুব ভোরে উঠে জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাগানে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকত। সত্তার নূতন আবির্ভাব তখন বালকের মধ্যে[১], তার নবোন্মেষিত, উৎসুক, পিপাসিত চৈতন্যের মধ্যে। ব'সে ব'সে সে আনমনা হয়ে কত কী ভাবত, হঠাৎ এক সময়ে টের পেত নারকেল গাছের সারির উপর থেকে প্রথম দিনের সূর্য (চিত্তোন্মেষের দিক থেকে এই দিনগুলি তার জীবনে প্রথম) তার বালক মিতাটিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করছে—কে তুমি? দেখে এসেছি লক্ষ লক্ষ ছেলে মায়ের পাশে ঘুমিয়ে আছে, দাওয়ায় ব'সে গল্প করছে, উঠোনে ছুটোছুটি করছে। তোমার মধ্যে এমন কী আছে যাতে ক'রে এই লক্ষ ছেলের মধ্যে তোমাকে আলাদা ক'রে তুমি ব'লে চিনব? বালক রবি নিরুত্তর। কী তার আছে যে তার মিতা তাকে চিনে রাখবে?

তার পরে পঁচাত্তর বছর কেটে গেল। কবির জীবনে অস্তগোধূলি, ডুবতে ডুবতে সেই প্রথম দিনের সূর্য, আবার শেষ বারের মতো প্রশ্ন শুধালো, 'কে তুমি?' এই জীবনের অবিরাম অক্লান্ত সাধনায় হয়তো কিছু কাজের মতো কাজ করেছে সেই বালক, কিছু দিয়েছে পৃথিবীকে, চল্‌তি কালের এমন কোনো বদল ঘটিয়েছে যা তাকে মহাকালের দরবারে (এবং মহাকালের প্রতীক নিত্যনব উদীয়মান ও অস্তমান

১. তুলনায়: প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ। (পত্রপুট, 'পনেরো')

সূর্যের কাছে) চিনিয়ে দেওয়া পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কোন্ ভরসায় এ-কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করবে সে; তার এই কীর্তিস্তম্ভ আজ যত উঁচুই দেখাক, তা কি মহাকালে গণ্য হবার, সযত্নে রক্ষিত হবার, যোগ্য? চুপ ক'রে রইল বৃদ্ধবয়সে উপনীত সেই বালক। জীবনান্তের অন্তিম সূর্য 'পেল না উত্তর'।

'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটিতে সৃষ্টি বা স্রষ্টা বিষয়ে কোনো অজ্ঞাবাদ ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত হয়েছে একজন ব্যক্তির অসম্পূর্ণ পরিচয়ের, অসমাপ্ত আত্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠার বেদনা। অবশ্য সেই একজনকে সর্বজনের প্রতিভূ মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তেমন সর্বজনীনতার আভাস তো শিল্পমাত্রেরই পশ্চাৎপটে কম্পমান। কবিতাটি ব্যক্তিবিশেষের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। পক্ষান্তরে, 'নবজাতকে'র 'প্রশ্ন' কবিতার পরিপ্রেক্ষিত আক্ষরিক এবং প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌম, একটি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক চিন্তাকে কেন্দ্র ক'রেই তার ভাবলোক গ'ড়ে উঠেছে। দুটি কবিতার কেন্দ্রে আছে একটি প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা ও প্রশ্নের উদ্দিষ্ট ভিন্ন। দ্বিতীয় কবিতার প্রশ্ন 'কে' নয়, 'কেন'। প্রশ্নকর্তা স্বয়ং কবি এবং আমরা সবাই। প্রশ্ন করা হয়েছে নক্ষত্রজগৎকে প্রথম স্তবকে, দ্বিতীয় স্তবকে মানবাত্মাকে! 'কেন' শব্দটি অবশ্য ব্যবহার করা হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিশব্দ 'কোন্ কাজে', দ্বিতীয় স্তবকের উপান্তে। প্রথম স্তবকের শেষ প্রশ্নটি অনুচ্চারিত রয়েছে। পরের স্তবকটি এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর বহন করে, এবং সেই সঙ্গে অন্য প্রশ্নটি জাগিয়ে তোলে।

কেন এই তারাপুঞ্জ শূন্যাকাশে মহাকাল-চক্রপথে অবিরত ঘুরছে, এত বেগ, এত তাপ, এত আলো কিসের জন্য? তার উত্তর—কোটি কোটি বৎসরের অসংখ্য ব্যর্থ প্রয়াস, ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতির পর মানবাত্মাকে জন্ম দেবে ব'লেই এত আয়োজন ছিল। কিন্তু মানুষের ভিতর দিয়েও তো চলার শেষ নেই, তার শারীরিক ও মানসিক

উপাদানগুলিও অবিরত 'ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত, পুঞ্জিত, নর্তিত'। প্রশ্নের উত্তর যে এখনো অসমাপ্ত। মানুষ তার পূর্ববর্তী জান্তব স্তর থেকে সামান্যই উপরে উঠেছে, আরও অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে হবে তাকে, হয়তো দেবতার সঙ্গে একাসনে বসবে সে একদিন। কিন্তু মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণায়ু, তার আত্মার বার্তা শেষ না হতেই, বলতে গেলে শুরু না হতেই, সে জলবিম্বের মতো লুপ্ত হয়ে যায়। তবে কেন এই নক্ষত্রলোক এবং তার ভিতর থেকে মানব-আত্মার জন্ম? এই আর্ত প্রশ্নের 'ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর'।

একটি উত্তর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভালোই জানা আছে, 'মানুষের ধর্মে' তার উল্লেখ রয়েছে। মানুষ অপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে অতি ধীর পদক্ষেপে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে সে জন্তুর যত কাছাকাছি ছিল, আজও সেখানেই আছে—এ-কথা সত্য নয়। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পরে দেবত্ব লাভ না করলেও দেবতার আরো কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে ভরসা করা যায়। তবে জীবজগতে বিবর্তন যেমন আপনিই ঘটে, মানুষের বিবর্তন তেমন স্বতঃস্ফূর্ত বা অবধারিত নয়; তার জন্য তাকে অজস্র বিঘ্নের মধ্যে অবিরাম তপস্যা করতে হবে হাজার হাজার বছর ধ'রে, তবেই সে কয়েক ধাপ উপরে উঠতে পারবে। যদি শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে বরণ করে তা হলে সে মনুষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ থেকে পতিত হবে। মানুষের উন্নতির পথ বিপদসংকুল, ক্ষুরধার। কিন্তু এই বিপদের সম্মুখীন না হ'লে তার আত্মার বার্তা অভিব্যক্ত হবে কী ক'রে? ইত্যাদি।

এই উত্তর আজ রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি দিচ্ছে না। মহামানবের হয়তো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই; কিন্তু যে কোটি কোটি ব্যক্তিমানুষ ইতিহাসের নিষ্ঠুর পথে তাদের আত্মার বার্তা সামান্যতম উদ্‌বোধিত করতে না করতে চিরতরে বিলীন হয়ে গেল, তাদের মানবিক অস্তিত্বের কতটুকু মূল্য তাদের কাছে বা আমাদের কাছে সত্য হল? বিবর্তনের রথ কি তাদের প্রত্যেকের বুকের উপর দিয়ে চ'লে গেল

না? এই অসংখ্য, অপূর্ণ, চিরতরে অবলুপ্ত ব্যক্তিস্বরূপের বেদনাই কবিকে ব্যথিত করেছে এ-কবিতায়। যে-উত্তরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (শুধু ভবিষ্যৎ নয়) প্রত্যেকটি মানবাত্মার সার্থকতার বার্তা শোনা যাবে, এই মহাশূন্যে তেমন উত্তর কোনোদিক থেকে উচ্চারিত হবে না?

প্রথম স্তবকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী পরিপ্রেক্ষিত অকস্মাৎ বদলে যায় দ্বিতীয় স্তবকে। এই পটপরিবর্তনের আকস্মিকতা দেখানো হয়েছে একটি অপ্রত্যাশিত ছোটো সরল বাক্যে—'আপনার পানে চাই'। দ্বিতীয় স্তবকে চলল একটি তুলনা দুই অজানার নিত্য গতির মধ্যে—বহ্নিবাষ্প ঘনীভূত হয়ে তারাপুঞ্জের উদ্ভব ঘটে যেমন, ইতিহাসের বাষ্প-পরিবেশ থেকে 'আমি'-পুঞ্জ তেমনি ঘনিয়ে ওঠে। তারপরে এই 'আমি'র রহস্য নিয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি; জটিল তার তত্ত্ব সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় আভাসিত। আবার আমরা চমকে উঠি একটি অত্যন্ত ঘরোয়া প্রায় মেয়েলি পঙ্‌ক্তিতে পৌঁছে—'কিছুই জানি না কোন্ কাজে'। দ্রুত উচ্চারিত পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির পরে এই পঙ্‌ক্তিটি দীর্ঘলয়ে খাটোগলায় পড়া দরকার। এর একটু উপরেই একটি ছোটো অব্যয়-পদ 'তখনো'-র উপর সমস্ত কবিতার এমফ্যাসিস (জোর?) এসে পড়েছে। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান নক্ষত্র-জগতের যে অত্যাশ্চর্য আলোক-চিত্র আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছে তা সবই কালো হয়ে যায় যখন ভাবি যে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিলীলার মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা, কোনো ভরসা নেই অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি'কে তার মুহূর্তের 'নিরর্থকতা' থেকে বাঁচাবার।

মনে প'ড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র ১৯ সংখ্যক কবিতায় বলে-ছিলেন, এই পৃথিবীকে 'একান্ত করে চাওয়া' আর 'একান্ত ছেড়ে যাওয়া'র মধ্যে যদি কোথাও কোনো মিল না থাকে তবে সেটা হবে নিখিলের এক বিরাট প্রবঞ্চনা, আর তা হলে 'সব তার আলো / কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।' ঐ কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যায়

পড়ি : 'অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্যফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে ? এই সৌন্দর্যের এমফ্যাসিসের মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্বগ্রাসী অ্যাবিস নয়।' কিন্তু 'নবজাতকে' দেখি পূর্বের ভরসা তাঁর ভেঙে গেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের তো কোনো ক্ষয় হয়নি, অথচ সেই সৌন্দর্যকে আজ আর মানুষের পরিপূর্ণ সার্থকতার গ্যারান্টি মনে করতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ। উলটো প্রশ্ন করছেন—মানুষই যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন নিখিলের এত আলো—'অসংখ্য তার পরমাণুর বিদ্যুৎ'—কোন্ কাজে লাগবে ?

সেই নৈরাশ্য আবার কবিকে আচ্ছন্ন করেছে যার ছায়া 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত বিস্তৃত। তখনো তাঁর মনে হয়েছিল : 'এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট/চৌদিকের চির নীরবতা'। আজ আবার বলছেন : 'বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,/ ধ্বনিবে না কোনই উত্তর।'

ইতিমধ্যে 'নৈবেদ্যে'র ঈশ্বরভক্তিতে 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বরপ্রেমে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন পরম সান্ত্বনার বাণী, পেয়েছিলেন পরিপূর্ণ ভরসা, নির্ভরতা, শান্তি। কিন্তু সে আলো বেশিদিন জ্বলেনি। সন্দেহের দম্‌কা হাওয়া লেগে এই আলোকশিখা ঈষৎ কেঁপে উঠেছিল 'বলাকা'-রচনাকালে যখন তিনি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় প্রথম দেখলেন দুঃখের 'অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।' ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে এ আলো তাঁর অন্তরের আলো নয়, বাইরে থেকে জ্বালানো হয়েছিল তাঁর পূজার মন্দিরে।

> শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
> পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
> কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
> তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
> পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
> আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
> কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন। —পত্রপুট, 'পনেরো'

এই নিভে-যাওয়া আলোর দিকে ইঙ্গিত ক'রেই কি ব্রাত্য কবি জীবনের শেষ কবিতায় প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে/সরল জীবনে'? কিন্তু ঐতিহ্য-বাহিত ধর্মবিশ্বাসের পথ অন্ধকার হয়ে গেলেও নক্ষত্রখচিত আকাশ' তাঁকে 'আপন আলোকে ধৌত' অন্তরের যে পথ দেখাল 'সে যে চিরস্বচ্ছ'।[১] সেই পথ বেয়ে তিনি চলে গেলেন আট দিন পর, ২২শে শ্রাবণে।

উত্তর

'কবিতা-পরিচয়ে'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলনে প্রকাশিত আমার দুটি লেখাকে ঘিরে আবু সয়ীদ আইয়ুব যে তর্ক তুলেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি। আমাদের এই অভাগ্য দেশে যখন মতান্তর মানেই মনান্তর অথবা গূঢ় অভিসন্ধির সন্ধান, তখন এ-ধরনের সুস্থ প্রত্যালোচনার প্রসারে খুশি লাগে। আইয়ুব সাহেব বর্ষীয়ান্ এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যপ্রেমী, ছাত্রবয়সে অনেক সময়ে দীক্ষার্থে গিয়েছি তাঁর কাছে ; তবে এ তো হতেই পারে যে কোনো কোনো বিষয়ে আজ আমাদের মিলছে না আর।

সব সময়ে যে মিলছে না তাও হয়তো নয়। হয়তো-বা পরস্পরকে বুঝতে ভুল করি অনেক সময়ে। অবশ্য তাঁর মতো পাঠকও যদি

---

১. 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে-ধর্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনের সুখ পাই আর না-পাই, আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।'—আত্মপরিচয়।

লেখা থেকে ভুল বোঝেন তবে সে নিশ্চয় তাঁর দোষ নয়, ধ'রে নিতে হবে আমারই রচনার কোথাও জটিল অপরাধ ছিল।

নইলে এ-কথা তাঁর কেন মনে হবে যে 'রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতাকে' আমি 'জাতিচ্যুত বলে বিচার' দিয়েছি? আলোচনা থেকে এই সামান্য-সিদ্ধান্ত কি অনিবার্য হয়? কোনো অগ্রিম অভিমান থেকে এ-রকম বলছেন না তো তিনি? তরুণেরা নির্মমভাবে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করেছে তাদের হৃদয় থেকে, এ কথাটা অত্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে বলেই কি? সন্দেহ নেই যে এমনও ঘটছে, কদিন আগেই সুনীল যেমন আক্ষেপ করেছেন: রবীন্দ্রনাথ নিজেই কখন তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিলেন এক সময়ে। তাঁর বেদনা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু আমারও হাত যদি ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথ তবে সেই মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যাবে আমার সমস্ত অস্তির বোধ। তাই ব'লে কি সঙ্গে-সঙ্গে এও মানব না যে অতিবাচনের ভার রবীন্দ্ররচনাকে থেকে-থেকে কেমন স্খলিত ক'রে দেয়? লক্ষ করব না যে শেষ বয়সে এই পল্লবিত ভাষণ বেড়ে গিয়েছিল আরো বেশি? অন্তিম দশ বছরে লেখা একুশটি কবিতা-বইয়ের প্রায় সাড়ে-আটশো কবিতার সর্বত্র কি সত্যি কোনো অনিবার্যতা অনুভব করি? ভালোবাসার ক্ষোভ জাগে না কি মনে-মনে, আরো একটু কম বললেন না কেন কবি? বিশেষ এক প্রেক্ষিতে এইটেই মাত্র জানিয়েছিলুম আমি: 'শেষ দশ বৎসরের কবিতায় খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন তিনি!' এর মানে নয় ঐ কালবর্তী সমগ্র কাব্যকেই 'জাতিচ্যুত ব'লে বিচার দেওয়া'। দুটি কবিতার মধ্যে অন্তত 'প্রথম দিনের সূর্যে'র প্রতি আমার অসীম আসক্তিই কি প্রকাশ পায়নি?

আইয়ুব সাহেব কখনো-কখনো বাক্যের এইরকম দ্রুত নিষ্পত্তি ক'রে নিয়েছেন মনে হয়, কখনো-বা নিয়েছেন তাকে খণ্ড ক'রে, আংশিক অর্থে। যেমন: 'রায় দিয়েছেন ওটা কবিতাই নয়, শেষ

লেখার ১৩ নম্বর কবিতার প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য'। তাই কি? আমি তো এই লিখেছিলুম: 'প্রথমে মনে হয় এটি ঐ কবিতারই ভাষ্যমাত্র, প্রাক্‌রচিত পদ্যভাষ্য—কিন্তু ক্রমে দেখা যায় দুটি রচনায় মিলও যেমন, ভিন্নতাও তার চেয়ে কম নয়।' এই ভিন্নতা বিষয়ে তিনটি সূত্রের আলোচনা ছিল লেখায়, যার অন্যতম একটি হচ্ছে বিস্তারিত বিশ্লেষণ-প্রবণতা। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে আমার দ্বিতীয় রচনাটিতে পূর্বাপর একটি আপেক্ষিক বিচার প্রচ্ছন্ন ছিল—প্রচ্ছন্নই বা কেন বলি, যথেষ্ট প্রকাশ্যেই ছিল—দুটি কবিতার রচনাভঙ্গির, উপস্থাপনার, তাৎপর্যের তুলনা। সমীপবর্তী হয়েও কবিতাদুটি অভিঘাতে কত স্বতন্ত্র, এবং কেন স্বতন্ত্র, এইটে দেখানোই ছিল আমার বিনীত উদ্দেশ্য।

'এরা সব উপাদান' থেকে শুরু ক'রে পাঁচ-ছটি লাইন যে আমার কাছে কবিতার পক্ষে আর অনিবার্য লাগে না, সে কি এজন্য যে ওখানে গদ্যের ব্যবহার আছে? গদ্যপদ্যের সনাতন তর্ক এখানে না উঠলেও পারে। এ-কথা আজ আর ঘোষণা ক'রে বলবার দরকার নেই যে, কোনো শব্দ বা কোনো বাক্যবন্ধই কবিতার পক্ষে 'বাধা' নয়, কিন্তু তার মানে কি এই যে, যে-কোনো শব্দ বা যে-কোনো বাক্যবন্ধই কবিতা? বিচার্য হচ্ছে এইটে যে, রচনা সর্বাত্মকভাবে কবিতার কোনো আভ্যন্তরীণ আলোড়নের দিকে আমাকে টেনে নিচ্ছে কি না, অথবা সেই টানে বাধা তৈরি করছে কি না কোনো আংশিক উপাদান। 'আমাকে' কথাটি অগত্যা বসাচ্ছি, কেননা সত্যি-সত্যি এ-সব বিষয়ে 'সর্বকালের মতো, সর্বাবস্থার জন্য, সর্বসম্মতিক্রমে' কিছুই বলা হয় না, বলা যায় না।

গদ্যপদ্যের তর্ক অন্য কারণেও নিষ্ফল। যে-অংশটি তর্কস্থল, সে তো গদ্য নয়, সে তো বিশেষরূপেই পদ্য। অভিযোগ তো এমন নয় যে কেন ঐ গদ্য অংশটি এল কবিতায়, অভিযোগ ছিল এই যে ওটা কেন পদ্যমাত্র হয়ে থাকছে, হয়ে উঠছে না কবিতা। 'ছন্দ আর

মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে যা কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, অনিবার্য' প্রশ্নটা এইভাবে ছিল ব'লেই বোঝা যায় যে এর গদ্য 'রূপে' নয় কিন্তু গদ্য 'পরিণামে'ই পাঠক হিসেবে আমার অস্বস্তি।

হতে পারে যে এর মধ্যেও কেউ কবিতার কিছু পাচ্ছেন। সেটা বিশেষের তর্ক, সামান্যের নয়। অন্তত সেজন্যে এলিয়টের উদাহরণ খুব সাহায্য করবে কি না, সংশয় থেকে যায়। তির্যক ও জটিল বাচনের সপক্ষে কবিতার বাচ্যার্থকে এলিয়ট যে সারমেয়মুখে মাংসখণ্ডের' মতো ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে-কথা না হয় তুলব না। কিন্তু 'ড্রাই স্যালভেজেস'-এর উদ্ধৃত অংশ যে কবিতা, সে কি কেবল তার দার্শনিক গদ্যভাষণের মহিমায়? অন্যত্র দেখা দিলে যে ওর 'কাব্যিক তাৎপর্য' ধরা পড়ত না, এ তো আইয়ুব নিজেই বলছেন। তাহলে সমগ্র কবিতায় যুক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে এর 'কাব্যিক তাৎপর্য' আসছে কোথা থেকে তা কি ভাবতে হবে না? আমরা লক্ষ করি যে বাক্যকটির সঙ্গে অব্যবহিত রূপে ছিল গীতিধ্বনিত ছন্দেমিলে গাঁথা ছত্রিশটি লাইন, তার পরে এক স্তরান্তর সৃষ্টির জন্য অতিকৌশলে এলিয়ট তাঁর পাঠককে কখন সরিয়ে নেন ঐ গদ্যবাচনের দিকে, নবীন অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতার এই পারম্পর্য, স্তর-বিনুনির এই টানাপোড়েন কবিতার অনুভবে কীভাবে সাহায্য করে, কবি তা দেখিয়েছিলেন 'কবিতার সংগীত' প্রবন্ধে: '....there are possibilities of transitions in a poem comparable to the different movements of a symphony of a quartet'! যে-সব সমালোচক দান্তের ধরনে এক চতুঃস্তর অর্থপর্যায় পর্যন্ত দেখতে পান এলিয়টের এই রচনায়, তাদের কথা গণ্য না করলেও বলা যায়, এই স্বরান্তর সৃষ্টির 'মুভমেণ্ট'ই নিছক গদ্য লাইনকে—তার গদ্যময়তা বা গুরুভার দার্শনিকতাকে—কবিতার দিকে তীব্র চাপে টেনে নিতে পারে।

সেই নিরিখে কি বিচার চলে রবীন্দ্রনাথের এই রচনার? যেমন

ধরা যাক, বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার ভাষাব্যবহার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই মানে বিচার্য হবে? সে-ধরনের মুভমেণ্ট কোথায় পাব এখানে? 'মননজাত অভিজ্ঞতার ফসল' যে দেখতে চাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায়, এ-সব ক্ষেত্রে তা সফল হতে পারছে কি? বহিরবয়বগত অল্পস্বল্প নতুন প্রকরণের কথা ছেড়ে দিলে অন্তর্গঠনের কোনো নবীন বিন্যাস কি সেভাবে রচিত হতে পারছে এই কবিতায়, যেমন আছে 'প্রথম দিনের সূর্যে'? এইটে ছিল তর্ক। এ-তর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ তুলবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে এই 'শেষ পর্বে' কবির অভিপ্রায় এবং রচনার মধ্যে, শিল্প বিষয়ে তাঁর ধারণা এবং প্রয়োগের মধ্যে, বহির্গঠন এবং অন্তর্বিন্যাসের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য ঘটছিল না, এক বিরোধ সঞ্চিত হচ্ছিল মুহুর্মুহু—যার ফলে একই সঙ্গে আমরা পেয়েছি অনেক স্খলিত রচনা এবং প্রতিভাবলে বিরোধ-উত্তীর্ণ অনেক দ্যুতিময় হীরকখণ্ড।

'প্রশ্ন' কবিতার তর্কসাপেক্ষ লাইনকটি গদ্যে বুঝিয়ে বলতে নাকি শতাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন। শতাধিক কেন, সহস্রাধিক হওয়াও সম্ভব। আবার অল্প কয়েক লাইনেও এক-রকম চ'লে যায়, যেমন সমালোচক নিজেই বুঝিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু 'এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়' (নয়ই তো, এ তো পদ্য)—'কারণ বিশুদ্ধ গদ্যে ঐ বক্তব্য-বিষয় একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত করা যায় না'—এও কি গ্রহণযোগ্য? পাস্কাল কী করেছিলেন, গূঢ় দার্শনিক পাস্কাল?

'বোঝানো' প্রসঙ্গে আমার নূতন কোনো তর্ক নেই, কেননা 'কমিউ-নিকেশন' বন্ধ ক'রে দিতে হবে এমন কোনো দূরতম অভিপ্রায় আমার রচনাটিতে আভাসিত ছিল ব'লে মনে করতে পারি না। অভিযোগ ছিল মাত্র হেতুহীন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা-প্রবণতার প্রতি, আইয়ুব তো আরোহী-অবরোহী যুক্তিসোপান পর্যন্ত কবির পক্ষে অগ্রাহ্য ভাবছেন!

উপরন্তু, তাঁর প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি কেন 'বলেছেন শঙ্খ ঘোষ'? ও-রকম লিখলে আমাকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কেননা আমি

মাত্র বলেছিলুম : 'ভাবাই শক্ত যে এই কবি এক সময়ে জানিয়েছিলেন, বোঝানোর দায়িত্ব নয় কবিতার, কবিতা কেবল প্রাণিত করতে জানে।'

২

কবিতাদুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাক্যবিস্তার নিষ্প্রয়োজন। উনি যেভাবে পড়েছেন আমি তেমন ভাবছি না, আমি কী ভাবে দেখেছি 'কবিতা-পরিচয়ে'র পাঠকেরা তা জানেন। 'যে যেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ জানে এক কেহ জানে আর'। যেমন, 'অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া' ইত্যাদি কথায় এমন অপরিহার্য জটিলতা আছে ব'লে এখনো আমার বোধে আসে না। দুঃখসুখময় এই অস্তিত্বের সত্যি মানে কী (পরিণামও সেই অর্থের অন্তর্গত) বোঝা যায় না, তাকে কেউ বলেন মায়া, কিন্তু মায়াই বলি আর যা-ই বলি সে-সবই শব্দমাত্র, তাতে ধরা পড়ে না এর অবাচ্য তাৎপর্য : 'যাই বলি শব্দ সেটা অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া'। এ-রকম অর্থঘন পঙ্‌ক্তি 'ফোর কোয়ার্টেটসে'র মতো কবিতাতেও দুর্লভ কি না, যোগ্য দার্শনিকেরা তার বিচার করবেন ভরসা করি ; আমার অক্ষম বিবেচনায় এখনো সে-রকম প্রত্যয় নেই।

'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটি বিষয়ে আমার ভাবনাকে আইয়ুবের হয়তো মনে হয়েছে 'চর্বিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা', এতে তাঁর মন সায় দেয় না ব'লে অন্য একটি অর্থ এর ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার এবং সমগ্রের জীবনসত্তা কী এক রহস্যময় অপরিচয়ে আবৃত আছে এই উপলব্ধি যদি হয় 'চর্বিত তত্ত্ব', তবে বলা প্রয়োজন যে উত্তীর্ণ কবিতাবলির অনেকটাই রচিত হয়ে আছে ঐ-সব বহুজ্ঞাত সহজ ধারণাগুলিরই নবীন ব্যক্তিগত উপলব্ধির স্পন্দে। তুচ্ছ ও সনাতন বিষয়ও যে আপনদেখার ভঙ্গিতে সুন্দর কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে, এ তথ্য তো নতুন নয়।

কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। একদা যে ছিল বালক, দীর্ঘ জীবনের

সাধনায় সে নিজেকে 'চিনিয়ে দেওয়ার' মতো কিছু করেছে, 'কিন্তু কোন্ ভরসায় এ-কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করবে সে'—এ-রকম একটা লাজুক ব্যাপার আছে নাকি ঐ 'স্ফটিকতুল্য' কবিতায় ? উদ্‌গ্রীব প্রত্যাশা, স্পন্দিত ব্যাকুলতা এবং নিষ্ফল হতাশ্বাসের আবেগে ছোটো এই রচনাটি এমন মথিত হয়ে আছে যে, নূতন এই ব্যাখ্যাটিকে পর্যাপ্ত ব'লে ভাবতে কেমন বাধা লাগে

আইয়ুব লক্ষ করতে বলছেন, প্রশ্নটি ছিল কী তুমি বা কেন তুমি নয়, কে তুমি। কিন্তু এটা বিশেষভাবে লক্ষই বা করব কেন? 'তুমি' কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে, মানবস্বভাবী এই নিকট ব্যক্তিত্বের আরোপের সঙ্গে সঙ্গে 'কে তুমি'ই তো অনায়াস-সংগত প্রশ্ন। প্রণয়িনীগণ মাঝে মাঝে রাগ ক'রে বলেন বটে 'তুমি একটা কী!' কিন্তু তা নইলে 'কী তুমি' প্রশ্নটা কি কবিতায় খুব মানবিক রূপে স্বাভাবিক ছিল? মানবীয়তা আরোপের পর কি আর এই রহস্যজিজ্ঞাসাকে এভাবে অনুবাদ করা যায়: এসো 'তোমার যাবতীয় গুণ ও ধর্ম, হেতু ও নিমিত্ত, আকার ও আয়তন, গঠনের উপাদান ও প্রণালী' জেনে নিই? 'কো তুঁহু বোলবি মোয়' এইটেই তো তখন একমাত্র প্রত্যাশিত প্রশ্ন।

পরিশেষে একটি সুজ্ঞাত তথ্যের উল্লেখ করি। কোনো প্রমাণ হিসেবে নয়, তবে কবিতাটি বিচারের পক্ষে আরো একটি অনুমান হিসেবে এর ব্যবহারযোগ্যতা ভেবে দেখা যায়। 'প্রথম দিনের সূর্য' রচনার অল্পদিন আগে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন কবি: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন? কিংবা জানেন না? এমন সন্দেহের বাণী বোধহয় জগতে আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয়নি যে যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না।···আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।'

অবশ্য এ-সব তর্কেরও কোনো শেষ মীমাংসা নেই। কথা চলতে থাকে— এই পর্যন্ত।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শঙ্খ ঘোষের পত্রের উত্তরে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

১. মতান্তর যে মনান্তর নয় এ-কথাটা তিনি স্পষ্ট ক'রে বুঝেছেন এবং স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রাজনীতি ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না, তার রীতিনীতিও রপ্ত ক'রে উঠতে পারিনি। কিন্তু সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই তাঁর মতের সমালোচনা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না, কোনো সার্থকতাও দেখি না। এ-সব ক্ষেত্রে যাঁরা অযোগ্য, তাঁরা অমনোযোগ্যও।

২. শঙ্খ ঘোষ বলেছেন তাঁকে আমি ভুল বুঝেছি। তবে তো আমার সব অনুযোগই খণ্ডিত হল। একটি অনুযোগ তবু রয়ে গেল— ভুল বোঝার পথ তিনি স্বহস্তে কেটে দিয়েছিলেন, আমি স্বখাত সলিলে পড়িনি। কেউ যদি লেখেন: 'শেষ দশ বছরের কবিতায় (অনায়াসে লিখতে পারতেন 'কয়েকটি কবিতায়' বা 'বেশ কয়েকটি কবিতায়', কিন্তু লিখলেন unqualified ভাবে 'শেষ দশ বছরের কবিতায়') খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন তিনি [রবীন্দ্রনাথ] : এবং কত সময়ে মনে হয়েছে এ কথা কেন কবিতায় বলতে হবে, এর মধ্যে কী আছে যা গদ্যেরই পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়? যেমন এই রচনাটির কিছু অংশ' এবং তার পরে 'প্রশ্ন' কবিতার সেই অংশগুলি বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, 'ছন্দ আর মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে যা কবিতা হিসেবে গ্রাহ্য, অনিবার্য, যা কেবলই গদ্য নয়', তাহলে যে-কোনো পাঠকের পক্ষে আমি যা বুঝেছিলাম তা ছাড়া অন্য কিছু বোঝবার খুব অবকাশ ছিল কি? এই বোঝাটাই কি অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে শঙ্খের মতে তাঁর অননুমোদিত 'প্রশ্ন' কবিতাটাই

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের কবিতার প্রতিভূ এবং ঐ পর্বের কবিতা সাধারণভাবে 'কবিতা হিসেবে অগ্রাহ্য'। যে-কোনো সামান্যোক্তির (generalisation-এর) ব্যতিক্রম অবশ্য থাকে। তাই যখন দেখি যে শঙ্খ 'প্রথম দিনের সূর্যে'র প্রতি 'অসীম আসক্তি' প্রকাশ করছেন, তখন পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলির অনুষঙ্গে কি এটাই ধ'রে নেওয়া স্বাভাবিক নয় যে রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের রচনায় 'প্রথম দিনের সূর্যে'র মতো দুটো-চারটে কবিতা তিনি পেয়েছেন যা তাঁর সামান্যোক্তির ব্যতিক্রম, এবং সেই আবিষ্কারের আনন্দটাকে বড়ো সুন্দর ভাষায় ঘোষণা করলেন 'কবিতা-পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যায়? 'প্রশ্ন' কবিতাটির নিন্দা-প্রসঙ্গে শেষ দশ বছরের কবিতা সাধারণভাবে নিন্দিত হল, কিন্তু 'প্রথম দিনের সূর্য' যখন দ্বিধাহীন ভাষায় প্রশংসিত হল তখন সাধারণভাবে শেষ দশ বছরের কবিতা তো দ্বিধাজড়িত কোনো প্রশংসাও পেল না। সমালোচনার এই ভেদনীতি কি তাৎপর্যহীন, অ্যাকসিডেণ্টাল?

৩. শঙ্খ 'প্রশ্ন' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত ক'রে বলেছিলেন: 'ছন্দ আর-মিল ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে···যা কেবলই গদ্য নয়'। আমি প্রতিবাদ করে লিখলাম: 'এই বাক্যগুলি বিশুদ্ধ গদ্য নয়'। তার উত্তরে শঙ্খ বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, 'নয়ই তো, এ তো পদ্য'। ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা যাই হোক, আমার নিজের ভাষায় বলি: কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি থাকলে সে কবিতার মূল্যহানি ঘটবেই এমন কোনো কথা নেই। গদ্যধর্মী পঙ্‌ক্তি ছন্দোবদ্ধও হতে পারে, ছন্দছাড়াও হতে পারে। এহ বাহ্য। আসল কথাটা হচ্ছে, সমগ্র কবিতাটি এগুলিকে নিঃশেষে শুষে নিতে পেরেছে কি না এবং শুষে নেওয়ার ফলে সমগ্রের ধর্মহানি হয়েছে কি না। কী ভাবে শুষে নেওয়া হবে সেটা কবি এবং কবিতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের এবং এলিয়টের (কিংবা বিষ্ণু দে-র) কাব্য-রসায়ন একই প্রকারে হবে, 'ড্রাই স্যালভেজেস'-এ এবং 'প্রশ্নে' গদ্যধর্মী

পঙ্‌ক্তির কাব্য-ধর্মান্তর একই প্রক্রিয়ায় ঘটবে—এ প্রত্যাশা কেন? এ-সব কথা নিয়ে মতান্তর যদি-বা থাকে তা উপরিতলের। আমাদের মধ্যে গভীর মতভেদ এই যে আমি মনে করি 'নবজাতকে'র 'প্রশ্ন' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম না হলেও ভালো কবিতা, প্রকাশ-ভঙ্গি শিথিল নয়, ভাবের জটিলতার সঙ্গে ভাষার গদ্যধর্মিতা তাল রাখতে পেরেছে; শঙ্খ মনে করেন 'প্রশ্ন' পদ্য কিন্তু কবিতা নয়, তার অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি 'কেবলই গদ্য', 'কবির অভিপ্রায় এবং রচনার মধ্যে সামঞ্জস্য' ঘটেনি। গভীরতর মতভেদ এই যে আমার মতে 'প্রশ্ন' ও 'প্রথম দিনের সূর্যে'র ভাব এবং ভঙ্গি উভয়ত ভিন্ন; শঙ্খের ব্যাখ্যানুযায়ী দুটো কবিতার ভাব একই, ভিন্নতা ভঙ্গিতে; সে ভঙ্গিগত প্রভেদ এই যে 'প্রশ্ন'তে অনেকগুলি 'অকবিতার অংশ' রয়ে গেছে, সেগুলিকে 'নির্মম ভাবে সরিয়ে দিলে' আমরা পাব 'প্রথম দিনের সূর্যে'র মতো 'একটি শুদ্ধ কবিতা'। গভীরতম মতভেদ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের মূল্যায়ন বিষয়ে। তাঁর বিচারে ঐ পর্বের কবিতা—অধিকাংশ কবিতা—'অতিবাচন', 'পল্লবিত ভাষণ', 'বিস্তারিত বিশ্লেষণপ্রবণতা' ইত্যাদি দোষে দুষ্ট; আমার ধারণা গান বাদ দিলে অন্য যে-কোনো দশ বছরের তুলনায় শেষ দশ বছরের রচনার সংহতিই লক্ষণীয়। ছোটো-ছোটো কবিতার সংখ্যাধিক্য সংহতির অভাব সূচনা করে না। তা ছাড়া এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে বোঝাতে' চাননি, অনেক কথাই বলেছেন; উপলব্ধির বৈচিত্র্যে এ-পর্ব বিশেষরূপে ঐশ্বর্যবান।

আসল কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের অধিকাংশ কবিতা শঙ্খ ঘোষের ভালো লাগে না, আমার লাগে। এ নিয়ে তো তর্ক চলে না। সাহিত্য-তত্ত্ব ও -নীতি নিয়ে অবশ্য চলতে পারে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমাদের সাহিত্যনৈতিক ভিন্নতার মূলে রয়েছে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ। আমি রবীন্দ্রনাথের (শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের) মানসিক প্রতিবেশী—খুব নিকট না হলেও

খুব দূরের নয়। সন্দেহ করছি শঙ্খের মানসিক স্বদেশ বহু নদীপ্রান্তর এবং হয়তো-বা পাঁচ-সাত সমুদ্রপারে। উত্তর আসতে পারে— জগৎনিরীক্ষায় মৌলিক দূরান্বয় থাকলেও সাহিত্যরসসম্ভোগে গরমিল ঘটবে কেন? পেশাদারি সাহিত্যবিচারে না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু একেবারে ভিন্ন মনঃপ্রতিন্যাস যাদের, তারা গানের একই ঝরনাতলায় গভীর অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। এ-প্রশ্নের স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন; ইচ্ছা রইল।

৪. শঙ্খ বলেছেন তর্কসাপেক্ষ পঙ্‌ক্তিগুলির বক্তব্য আমি নাকি কয়েক লাইনেই বুঝিয়ে বলেছি। কথাটা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিচিত এবং আংশিকভাবে উদ্ধৃত সুন্দর কবিতাটির আশ্রয় না থাকলে গদ্যরচনা হিসেবে ঐ কটি লাইন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। যেভাবে বুঝিয়ে বলা গদ্যে সংগত ও প্রত্যাশিত তেমন ক'রে মোটেই বলা হয়নি। আরো অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা না করলে ঐ কথাকটি নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারে না। ভাষার যাদু যার জানা নেই তাকে যুক্তির সাহায্য নিতেই হয়। পাস্কালের কথা তুলেছেন তিনি, কিন্তু 'পাঁশে' তো বিশুদ্ধ গদ্য নয়, গদ্যকবিতার সমষ্টি। কয়েকটি তার উৎকৃষ্ট কবিতা হয়েছে, কোনোটাই 'গূঢ় দার্শনিক' তত্ত্বের গদ্যব্যাখ্যান রূপে গ্রাহ্য নয়।

৫. 'কে তুমি' প্রশ্ন অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা লিখেছেন—'শেষ সপ্তকে'র শেষ কবিতা (৪৬ সংখ্যক)। 'প্রথম দিনের সূর্য' ব্যাখ্যা করবার সময়ে এই কবিতাটির কথা মনে ছিল না, নইলে সেখানেই উল্লেখ করতাম। এই কবিতাটি খুব রসোত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু 'কে তুমি' প্রশ্নটি যে রবীন্দ্রনাথের মনে বহুদিন থেকে আন্দোলিত ছিল এবং ঠিক কী অর্থ বহন করত তা এখান থেকে বোঝা যাবে।

সব শেষে একটা অনুরোধ। আমার নামের সঙ্গে 'সাহেব' লেজুড়টি জুড়ে না দিলে আরো খুশি হতাম। উর্দু ভাষায় সেটা খুব মানায়,

বাঙলায় একেবারেই না। আর নামই তো যথেষ্ট। নিতান্ত যদি একটি লেজুড় লাগাতেই হয় তা হলে সরকার-বাহাদুরের অনুমোদিত 'শ্রী' তো রয়েছে—লেজুড় হিসেবে সবচেয়ে কম আপত্তিকর। আমি বলি কী, ও-সব শ্রী-ট্রি সরকারী খাতাপত্রের জন্যই তোলা থাক, আমরা বেসরকারী লেখক মানুষ, আমাদের পক্ষে 'নাম—শুধু নাম—শুধ্ নাম'ই যথেষ্ট।

উত্তর

আবু সয়ীদ আইয়ুবের পুনরভিযোগ বিষয়ে তর্কবিস্তার আর সংগত নয়, সামান্য দু-একটি ইঙ্গিতমাত্র বলি। তাঁর নামের সঙ্গে 'সাহেব' কথাটি অতঃপর আমি অবশ্যই বর্জন করব। কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে, এজন্য নয় যে বাঙলায় এটা রীতিবিরুদ্ধ। এই ব্যবহারই যে সৌজন্য-সম্মত সে-কথা আমরা বাল্যবয়স থেকে শিখেছি গ্রামবাংলার সাধারণ্যে এবং যৌবনে জেনেছি সাহিত্যের অনুশীলনে। যেমন ধরুন পঁচাত্তর বছর বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথেরই একটি লাইন: 'আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ……' ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার মূল প্রসঙ্গে:

১. আইয়ুবের দ্বিতীয় সূত্রে উল্লেখ-করা আমার বাক্যের 'কত সময়ে' শব্দদুটি লক্ষ করবার পরেও 'যে-কোনো পাঠকের' কী মনে হবে, সেটা পাঠকের উপর নির্ভর করে।

২. তৃতীয় সূত্রে সম্ভবত আমার ভিন্ন দুই উক্তির বিরোধ কল্পনা ক'রে একটি বিচলিত প্রশ্ন আসছে: 'ব্যাপারটা কী?'—এর উত্তরে একটু চুরি ক'রে বলতে লোভ হয় যে ব্যাপারটা ঠিক তা-ই যা এ বলছে। ছন্দ-মিলের পরিমিত ব্যবহারের মধ্যে এলেই সেটাকে বলি পদ্য বা ভার্স, গদ্যের বিপরীত। কবিতায় এর ব্যবহার হয়, কিন্তু পদ্য হলেই সেটা অনিবার্যত কবিতার দিকে যায় না, যেতে পারে গদ্যেরও

পরিণামে। আমার লেখায় এই ছিল যে ছন্দমিলের পদ্যময়তা ছাড়া ওর মধ্যে কবিতার কিছু নেই—যা আছে তা গদ্যেরই বহন করবার কথা।

৩. চিঠিতে দেখাতে চেয়েছিলুম কোথায় আইয়ুব ভুল বুঝেছেন। যেখানে বাস্তবিকই মতপ্রভেদ, সে-বিষয়ে আলোচনা বাহুল্য বোধে বিস্তৃত করিনি, আভাসমাত্র ছিল। কিন্তু এখন আমার মূল লেখা থেকে অন্তত দু-একটি বাক্যাংশ পুনরুদ্ধৃত করবার প্রয়োজন দেখছি। কবিতাদুটির তুলনাপ্রসঙ্গে ছিল: 'এদিক থেকে রচনার বিষয়গত সাদৃশ্যও সরে যায়'। অথবা, আবার, 'বিষয়গত সমীপতা সত্ত্বেও কেবল স্বরের জন্য দুটি লেখা কত ভিন্ন কবিতা হয়ে উঠতে পারে…।' শেষ বাক্যে 'সমীপতা' শব্দটির অর্থের প্রতি মনোযোগ দাবি করা যায়।

৪. চতুর্থ সূত্র প্রসঙ্গে তর্কটা উঠেছিল মুদ্রণপ্রমাদের সুযোগে নয়, মুদ্রণপ্রমাদ এবং লুপ্ত-কোনো-অংশ অনুমান ক'রেই। তা নইলে, কোনো বক্তব্যই 'বিশুদ্ধ গদ্যে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে বলা যায় না'—কেবলমাত্র এই কথার প্রতিবাদে পাস্কাল পর্যন্ত যাবার দরকার করে না। আইয়ুব লিখেছেন পাঁসে-র 'কোনোটাই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের গদ্য-ব্যাখ্যান রূপে গ্রাহ্য নয়'। নয়ই তো। 'ব্যাখ্যান' হলে কি এখানে পাস্কালের নাম উঠত? সংহত সূত্রের মতোই (সর্বত্র নয়) তিনি তাঁর গভীর ভাবনা বলেছেন, এইটেই ছিল বক্তব্য।

সাগরপারের কথা উঠল কেন হঠাৎ? আমার কি নির্বাসন?